রজত জয়ন্তী

১৯৮৮-২০১৩

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জিয়াউদ্দীন আহমেদ

প্রকাশনা কমিটির সভাপতি
মোঃ আদম আলী

প্রকাশনা কমিটির সদস্যবৃন্দ
ডাঃ নূর মোহাম্মাদ আলী আজম
মোঃ মুছলিম মিয়া
মোঃ খসরুজ্জামান
মোঃ হাবিবুল্লাহ্
দেলোয়ারা বেগম
নাজিম উদ্দিন
কামাল আহমেদ
আ ক ম ইকবাল হোসেন
আবুল আহসান বিশ্বাস
শামীম আরা মুন্নি
মোঃ সানাউল হক
মোঃ ফজলুল হক
মোঃ হুমায়ুন কবীর মজুমদার
মোঃ শাহরিয়ার মুরাদ
সোমেন চৌধুরী
সীমা বড়ুয়া

প্রকাশকাল
২৬ জানুয়ারি ২০১৩, ১৩ মাঘ ১৪১৯

প্রকাশনায়

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
গাজীপুর-১৭০৩

রজত জয়ন্তী

১৯৮৮-২০১৩

রজত জয়ন্তী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

সভাপতি

মোঃ আজহারুল ইসলাম

সদস্য সচিব

এহ্‌তেশামুল করিম

সদস্য

মোঃ মাহাবুবার রহমান
মোঃ কালিমুল্লা
মোঃ আদম আলী
মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
রশিদ আহমেদ
ডাঃ নূর মোহাম্মদ আলী আজম
মোঃ মুছলিম মিয়া
মোঃ আবু সাঈদ
মোঃ খশরুজ্জামান
মোঃ হাবিবুল্লাহ
মোঃ আব্দুল করিম খান
মোঃ আব্দুর রউফ
নাজিম উদ্দিন
মোঃ হাবিব উল্লাহ্‌ তালুকদার
এফ এম মোরাদ হোসেন
মোঃ ফজলুল হক

সূ চি প ত্র

বাণি ০৫

রজত জয়ন্তী পরিক্রমা ও অলিক ইশারা
মোঃ আদম আলী ১৩

আমাদের কাগজেরনোট
মোঃ মুছলিম মিয়া ১৫

স্মৃতির বিস্মৃতি
জিয়াউদ্দীন আহমেদ ১৭

আপনাদের জানা আমার কিছু কথা
খান আব্দুস সোবহান ২১

করপোরেশনে কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিক অংশ গ্রহণ) আইন ১৯৬৮ বাস্তবায়নের গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতিকথা
খাজা আব্দুল মোমেন ২৩

টাকশালের স্মৃতি কথা
মাহমুদা খাতুন ২৪

স্মৃতি চারণা
মোঃ জামিল আখ্‌তার শাহ্‌জাদা ২৫

যা মনে পড়ে
মোঃ হাবিবুল্লাহ ২৮

স্মৃতির পাতায়
দেলোয়ারা বেগম ২৯

টাকশাল ঃ সেকাল আর একাল
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ৩১

এ ট্রিবিউটি টু কর্নেল একেএম সিকান্দার হোসেন; যে কথা 'আনোয়ার'কে আজও বলা হয়নি
জহুরুল ইসলাম ৩৪

নানান রঙের দিনগুলি (নেত্রকোণা টু গাজীপুর)
জামাল উদ্দিন আহমেদ ৩৬

একটি চিঠি এবং কিছু কথা
আবুল আহসান বিশ্বাস ৩৮

এক টুকরো স্মৃতি
শেগুফতা আনজুম আজিজ ৩৯

স্মৃতিময় টাকশাল
সোমেন চৌধুরী ৪০

দই এর স্বাদ ঘোলে....
আলেয়া খাতুন ৪১

ভুলিনি তোমায়
মোঃ আব্দুর রউফ ৪৩

৪০ জনের সাথে আমি
মোঃ হারুন-অর-রশিদ ৪৪

কিছু স্মৃতি কিছু ধৃতি
ম. ওওফিকুর রহমান ৪৫

স্মরনীয় স্মৃতি
আনোয়ার-উল-হুদা ৪৮

আমাদের প্রিয় টাকশাল
অশেষ বিশ্বাস ৪৮

সেইসব দিনের অম্লান স্মৃতিচারণ
তাহেরা খানম ৫০

মজা পুকুর থেকে 'জলকণা'
সৈয়দ আহমেদ ৫১

ট্রেড ইউনিয়ন ও আমার অভিজ্ঞতা
মোঃ শফিকুল ইসলাম ৫২

হারিয়ে গেল জীবনের ২৫টি বছর
মোঃ দেলসাদ আলী ৫৪

টাকশালে আমার ২৫ বছর
মোঃ আমজাদ হোসেন ৫৫

শুধুই আমার স্মৃতি থেকে
মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ ৫৬

স্মৃতির বিষণ্ন বেলুন
সুলতান আহমেদ ৫৮

টাকশাল আমার দ্বীনি মেহনতের হাতেখড়ি
মোঃ আমিনুল ইসলাম ৬০

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন হতে যারা অবসরে গেছেন... ৬১

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন -এ যারা নির্বাহী প্রধান ছিলেন ৬২

স্মৃতির পাতায়... ৬৩

যাদের আমরা হারিয়েছি... ৮০

25
রজত জয়ন্তী
1988
2013

বাণী

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর নোট মুদ্রণের ২৫ বছর পূর্তিতে রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যায় (আর্কিওলজি) পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার জীবনাচরণ, শিক্ষা, নানান সংস্কৃতির বিষয়ে আমরা গবেষণালব্ধ জ্ঞান অর্জন করি। এ বিদ্যার সাথে মুদ্রা সৃষ্টির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় সভ্যতায় মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনতার ৪১ বৎসরে বাংলাদেশের সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনের ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এটা আমাদের একটা বিশাল অর্জন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশাপাশি আমাদের জাতির জনক, আমাদের স্বাধীনতার চেতনা, ঐতিহ্য এসব কিছু দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে ধারণ ও লালন করছে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন মুখ্য কর্মযজ্ঞ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এ জাতীয় প্রথিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আমি পালন করে আসছি। আমি বিশ্বাস করি দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তনে সামাজিক জীবনে, সংঘে বা প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান গুণগত ও পরশাণগত পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। বিগত চার বৎসরে কর্পোরেশনের কাজ, সামর্থ্য সৃষ্টি, আধুনিকায়ন, কাঁচামাল আমদানি ও মূদ্রণ বিষয়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব সবকিছু এমন দক্ষতা ও আন্তরিকাতার সাথে পরিপালিত হয়েছে যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য আজ দৃশ্যমানভাবে ঈর্ষনীয়। বিশেষ করে, কাঁচামাল সংগ্রহ উপযোগী ও কার্যকর মেশিন সংগ্রহ, নোটের অরিজিনেশন, বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসমন্বয় প্রতিটি স্তরে অনেক সীমাবদ্ধতা উত্‌রিয়ে চাহিদা ও সরবরাহের সুসমন্বয় সহজ কোনো বিষয় নয়। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান আজ তুলে না ধরলেই নয়। বিগত ২০০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২ অর্থবছরে ব্যাংক/কারেন্সী নোট এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূদ্রণ উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬২ শতকরা ৭১ ভাগ। পৃথিবীতে উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে আমাদের নিজস্ব ব্যাংক/কারেন্সী নোট আমরা নিজেরা উৎপাদন করছি; এরূপ উৎপাদনের সামর্থ্য ও গৌরববোধ পৃথিবীর অনেক দেশেরই নেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইনের ৮টি মূল্যমানের ব্যাংক/কারেন্সি নোট প্রবর্তনের যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম তার সফল বাস্তবায়নও দ্রুততার সাথেই সুসম্পন্ন হয়েছে। এসবকিছুর জন্যে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ম্যানেজমেন্ট, পরিচালক পর্ষদ সংশ্লিষ্ট সবাই অবশ্যই বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখতে পারে।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি: এর নীতি-নির্ধরণী কাজ ও অগ্রগতিতে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করছি। কর্পোরেশনের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর একঘেয়েমী কর্মজীবনের শুধু অবসান হবে না, প্রতিষ্ঠানের গাম্ভীর্য ফুটে ওঠার পাশাপাশি স্মৃতিচারণ, বিনোদন, কাজের স্বীকৃতি এক কথায় কর্মীদের মাঝে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসবে।

শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও নানা সীমাবদ্ধতায় যে জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল, অচিরেই তার সফল সমাপ্তি ঘটবে- আমি সে প্রত্যাশা করি। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনকালিন সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সকল পরিচালক, নির্বাহী, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন এর রজতজয়ন্তী সফল ও সার্থক হোক কামনা করি।

(ড. আতিউর রহমান)

বাণী

সচিব
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয় ও
পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ ব্যাংক ও কারেন্সী নোট এবং অন্যান্য সিকিউরিটি প্রোডাক্টস উৎপাদন করে থাকে। নিরাপত্তার সামগ্রী মুদ্রণ ও উৎপাদনে এটি দেশের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এই করপোরেশনের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকার আমাকে মনোনীত করেছে। ব্যাংক/কারেন্সী নোট মুদ্রণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উদযাপন ও স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমি করপোরেশনের সকল কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি তাদের এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞের মাঝে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী উদযাপন এবং স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সামগ্রিক আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ড. এএ অঠগওঠএ অঠওএ)

বাণী

ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক
ও
পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার সকল ব্যাংক ও কারেন্সী নোট মুদ্রণ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতিতে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধনে জড়িত থাকার পাশাপাশি নোট মুদ্রণের ২৫ পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নিরলস কর্ম প্রচেষ্টার ফাঁকে স্মরণিকা প্রকাশ কর্মীবাহিনীর মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে ভুমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি। এতে কর্মীদের উচ্ছ্বাস, পাওয়ার আত্মগত উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটবে এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের মানসিক প্রশান্তি আসবে।

আমি এ স্মরণিকা প্রকাশের সফলতা কামনা করি এবং মহতী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

(এঠঞ অঠউণও কঠগেএ)

বাণী

অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও
পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যাংক ও কারেন্সী নোট উৎপাদনের পঁচিশ বছরের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা বের হচ্ছে। করপোরেশনের এই মননশীল উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

করপোরেশনের পরিচালক পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে আমি এর কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে বিগত দুই বছর পর্যবেক্ষণ করছি এবং সরেজেমিনেও এই প্রতিষ্ঠানটি আমি পরিদর্শন করেছি। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যতিক্রমধর্মী এবং তাদের বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে একদল কর্মী বাহিনীকে দিন-রাত নিরলস কাজ করতে দেখেছি। এরা কাজের বৈশিষ্ট্যে অনেকটা সমাজ থেকে নিজেদের দুরে রাখছে। তবে এদের বিরল, নির্জন, শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ আকর্ষণীয়।

এই সুন্দর উদ্যোগের সর্বাত্মক সাফল্য কামণা করছি; আশা করি করপোরেশনের এই সৃজনশীল প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

(ড. কঠএঠও উডদ্দই অঠঘএেদ)

বাণী

যুগ্ম-সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,
অর্থ মন্ত্রণালয় ও
পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যাংক নোট উৎপাদনের পঁচিশ বৎসর পালনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রয়াস তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে।

উৎপাদন কার্যক্রমের পাশাপাশি রজত জয়ন্তী উদযাপনের মত একটি অনুষ্ঠান করপোরেশনের কর্মে উৎসাহ ও সংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার স্বল্প সময়ের সম্পৃক্ততায়; তাদের ভিন্নধর্মী কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণে আমি সন্তুষ্ট এবং তা প্রশংসার দাবী রাখে। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য দেশ ও জাতির জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

আমি এ প্রতিষ্ঠানের এবং এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

(এ এএ এএ অঠজঘঠও)

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা ও
পরিচালক, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টার পাশাপাশি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক নোট উৎপাদনের পঁচিশ বৎসর পূর্তিতে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচায়ক। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের কর্মকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট; অন্যদিকে এর পরিচালক পর্ষদের একজন পরিচালক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মনিটরিং করার একটা সুযোগ আমার রয়েছে। করপোরেশনের রজত জয়ন্তীতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগও একটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে এই অনুষ্ঠানের একটি সক্রিয় অংশীদার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকাণ্ড উৎপাদন শিল্পে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে করপোরেশনের সাথে জড়িত সকলের সৃজনশীল মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটবে।

আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

(ইঠছেউ দেঙৌঠছঠও ঘেঠগেই)

আমার কথা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

আমি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সকল সহকর্মীর সাথে মিলেমিশে রজত-জয়ন্তী উদযাপনের আয়োজনে আছি। পরিচালক পর্ষদের একজন পরিচালক হিসেবে আমাকেও বাণী দিতে হচ্ছে। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সকল পরিচালক আয়োজকদের ধন্যবাদ দিয়েছেন; আয়োজনে থাকায় আমিও এই ধন্যবাদের অংশীদার।

তাই আমার বাণী আমার সকল সহকর্মীদের জন্য। দুঃখটা স্থায়ী হলেও সুখের প্রত্যাশী আমরা সবাই। আনন্দ-উল্লাসে সম্পৃক্ত হতে আমার ভালো লাগে। তাই এখানে নতুন আনন্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি, পুরাতন আনন্দ নবরূপে আবিস্কার করাতে সহকর্মীদের উৎসাহিত করেছি।

প্রতিষ্ঠানের কাজ ও সহকর্মীদের সাথে একাত্ম না হলে প্রতিষ্ঠান কখনো আপন করে নেয় না। এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, আমার ধারণা, যেকোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী। ফলে এদের বিনোদনের সীমিত সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় অনেক বেশি। ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণে থাকা সত্বেও এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি অনুভব করি।

একসময় আমার লেখা-পড়ার অভ্যাস ছিলো; এখন নেই বললেই চলে। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে অফিসের দিকে রওনা দিই; অফিস শেষে আবার যখন বাসায় ফিরি তখন রাত নয়টা বা দশটা। তাই পড়া-লেখা করার সাহস পাচ্ছি না। এর ফলে জানা যাচ্ছে না, যা জেনেছিলাম তাও ভুলতে বসেছি। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকলেও আমি সহকর্মীদের সহায়তা নিয়ে অফিসের প্রতিটি কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করে থাকি। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকাকালীন আল্লাহ মালিক কাজেমী স্যারের কাছে শিখেছি, নথিতে কোন 'জরুরী' ফ্ল্যাগ থাকবে না, কারণ প্রতিটি নথি-ই জরুরী। যারা এইখানে এই মনোভাব নিয়ে কাজ করেন না, তাদের সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। ডেপুটি গভর্নর রুহুল আমিন স্যারের কাছে শিখেছি, কোন কাজ করার জন্য পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সামর্থ অনুযায়ী কাজটি করার চেষ্টা করা হয়েছে কী না তাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিবেচ্য হওয়া বাঞ্চনীয়। চৌকষ ঘোড়ার চেয়ে 'উইলিং হর্স' কাম্য।

এখানে কাজ করে আমি আনন্দ পাই; উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান বলে প্রবৃদ্ধি অংকে কষে প্রমাণের সুযোগ রয়েছে। উৎপাদনের দ্রুত অগ্রগতিতে সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, সুবর্ণ-জয়ন্তীতে তারা অহঙ্কার করে বলতে পারবে,'২৭ বছরের পুরানো মেশিন সচল রেখে আমরা পাঁচ বছরে ষাট শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিলাম' যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত গড়েছিলেন তাঁদের অবদান সবার উপরে। সূচনাপর্ব ও পরবর্তী কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়নে ধীশক্তি ও প্রতিভার প্রয়োজন হয়। যাঁরা আমার পূর্বে মহাব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন তাঁদের সবাই শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ নন, অনেকেই আমার সরাসরি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁদের নিকট শিখে আমি তাঁদের অনুকরণে এই প্রতিষ্ঠান একক নির্বাহী ক্ষমতায় পরিচালনার সাহস পেয়েছি। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

বর্তমান গভর্নর মহোদয়ের শর্তহীন নিয়মমাফিক সমর্থন আমাকে আমার কাজে একাগ্র ও সাহসী করেছে। তাঁর ইতিবাচক সমর্থন আমাদের সকল প্রাপ্তির তৃপ্তি দিয়েছে। পর্ষদের পরিচালকগণও সকল সময় প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের ভেবেছেন, তাই উৎপাদনে সমৃদ্ধি আসছে।

বিগত প্রায় সাত বছরে আমি ২/৩ দিনে বেশি ছুটি ভোগ করি নাই। তাই প্রেষণে হলেও আমি এই প্রতিষ্ঠানটিকে 'আমার' ভেবেছি।

সকলের দোয়া চাই।

(ডজছঠউদ্দঢই অঠঘঐেদ)

টাকশালের গোড়াপত্তন

মহাব্যবস্থাপক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
ও সভাপতি
রজত জয়ন্তী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

দেশের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এক অনিবার্য শর্ত হচ্ছে, দেশের কারেন্সী/ব্যাংকনোট এর মুদ্রণের পরনির্ভরশীল না হওয়া। আর এরই চেতনায় কারেন্সী ও ব্যাংক নোট, স্ট্যাম্পস এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস নামে একটি কারেন্সী/ব্যাংকনোট নিরাপত্তা দ্রব্যাদি মুদ্রণালয় স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। আর এভাবেই বাংলাদেশে টাকশালের পথচলার সূচনা।

১৯৮১ সালে বিশ্বের একমাত্র বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যান্ডের ডি লা রু জিওরী কে দায়িত্ব দেয়া হয় কারেন্সী/ব্যাংকনোট মেশিন প্রতিস্থাপন ও কমিশনিং এর জন্য। ১৯৮৫ সাল ছিল পরীক্ষামূলক উৎপাদনের টার্গেট। কিন্তু সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং এর কার্যক্রমে আশানুরুপ অগ্রগতি না হওয়ায় ১৯৮৮ সালে টাকশালে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে।

প্রথম পরীক্ষামূলক উৎপাদন হয় এক টাকার কারেন্সী নোট মুদ্রণের মাধ্যমে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল ডিনোমিনেশনের ব্যাংক নোটের বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্পন্ন করা হয়।

১৯৮৮ সনে ১ টাকার কারেন্সী নোটের উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের উৎপাদনের যে পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল তা আজ ২০১৩ সনে এসে ২৫ বৎসর পূর্ণ হলো। এই পথ পরিক্রমা সবসময় মসৃণ না হলেও সকল চড়াই-উৎরাই, সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা সফলতার সাথে আমাদের উৎপাদনের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি।

অনেক শহীদের রক্তস্নাত বাংলাদেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত এই টাকশাল (দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেড) দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ দেশের সেবায় নিরলস অবদান রেখে চলেছে। এমনকি দেশের রাজস্ব খাতেও অত্র প্রতিষ্ঠানের অবদান সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমার প্রত্যাশা আগামী দিনেও এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অত্র করপোরেশনের সকলেই গভীর দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করে যাবো।

(এঠঞ অঠজঘঠওট্রও ইগওঠএ)

রজত জয়ন্তী পরিক্রমা ও অলিক ইশারা

মোঃ আদম আলী
মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানী সচিব

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ তার নিজস্ব ব্যাংক ও কারেন্সী নোট প্রবর্তন করেছে; তবে সে সময় দেশে নোট মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ থেকে নোট আমদানী করে দেশের চাহিদা মেটানো হয়েছে। নিরাপত্তা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে যে কোন স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রতীক। দেশের ব্যাংক নোট ও কারেন্সী নোট এবং মূল্যবান নিরাপত্তা দলিলাদি দেশে মুদ্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সনে গাজীপুরে ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনে পরবর্তীতে আরো ১৬.৫২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর ২৭.১১.৮৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ১৯৮৮ সনের জুন মাস থেকে ১ টাকার কারেন্সী নোট এবং একই বছরের নভেম্বর মাস থেকে ১০ টাকা মূল্যমান ব্যাংক নোট পরীক্ষামূলক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের পদযাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৮-১৯৮৯ সনে ২৮৮ মিলিয়ন পিস নোট উৎপাদিত হয়।

৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ২২ এপ্রিল, ১৯৯২ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রেজিষ্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, ঢাকা এর অফিসে নিবন্ধিত হয়। প্রকল্পের মালিকানা, দায়-দায়িত্ব কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও কোম্পানীর মধ্যে ভেন্ডর্স এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিবন্ধিত সংঘ-স্মারক ও সংঘবিধি মোতাবেক কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা ও পরিশোধিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন বাংলাদেশ ব্যাংককে চুক্তি মোতাবেক শেয়ার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প স্থাপনে অবশিষ্ট ব্যয় বাবদ ৭৫ কোটি টাকা সুদসহকারে বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করা হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেও এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নেই। উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার নিজস্ব নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে যা অবশ্যই জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির ২৬.২.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে করপোরেশনের কাজের গুণগত মানের প্রশংসা করা হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠান হতে দোয়েল পাখির ছবিযুক্ত ছাপানো বাংলাদেশ সরকারের ২ টাকার নোটটি রাশিয়ার একটি জরিপ সংস্থার রেঙ্কিং-এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নোট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাংক নোট ছাড়া অন্যান্য যে সকল সিকিউরিটি প্রোডাক্টস উৎপাদিত হয় সেগুলোও উচ্চ মুদ্রণমান সম্পন্ন; এ প্রতিষ্ঠানের এক সময়ের উৎপাদিত স্ট্যাম্প আর্ন্তজাতিক ফিলাটেলিক ব্যুরো কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সনে সার্কভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের ডাক বিভাগের পোস্টাল স্ট্যাম্প মুদ্রণ করেছে। অতি সম্প্রতি ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা ২০১০ এর আওতায় ২০০৯-২০১০ করবর্ষের সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে সরকার কর্তৃক যে ১০টি প্রতিষ্ঠানকে ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে অত্র করপোরেশন তাদের অন্যতম।

করপোরেশনের নোট প্রিন্টিং হলে ৫টি উৎপাদন লাইনের ১৩টি মেশিন সংস্থাপনের স্থান সংকুলান থাকলেও সংস্থাপনকালীন যে ২টি উৎপাদন লাইনে ৫টি মেশিন সংস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন চালু করা হয়েছিল তার সাথে ক্রমবর্ধমান নোটের চাহিদা পূরণে গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১টি ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিং মেশিন সন্নিবেশিত হওয়ায় নোট প্রিন্টিং মেশিনের সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা ব্যবহার করে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট ১১৩৮.৪৫ মিলিয়ন পিস নোট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

ব্যাংক ও কারেন্সী নোট ছাড়াও চেক, স্ট্যাম্প (জুডিশিয়াল, নন-জুডিশিয়াল, পোষ্টাল, বীমা এবং অন্যান্য) সরকারী বিল, বন্ড, শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র, নিরাপত্তা প্রত্যায়নপত্র, জমাদানের প্রত্যায়নপত্র, লগ্নিকারী বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ইউনিট এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের জন্য পূর্বোক্ত ধরনের দলিলাদি ছাপানো হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দলিলাদি ছাপানোরও সুযোগ রয়েছে। এখানে সকল ধরনের মুদ্রণ কার্যে সর্ব্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়। উল্লেখিত আইটেম ছাড়াও বর্তমানে কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার ব্যান্ডরোল ও টয়লেট সোপ স্ট্যাম্প, সিগারেট স্ট্যাম্প ও ব্যান্ড, MICR চেক ইত্যাদি মুদ্রণ করা হচ্ছে। ওএসপি বিভাগের মেশিনগুলো সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা চালু রেখে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট ১১,৮৭৫.৭১ মিলিয়ন পিস ওএসপি প্রোডাক্ট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

২৫ বছরের অগ্রযাত্রার সূচনালগ্নে এ প্রতিষ্ঠান আজকের মতো কোলাহলমূখর ছিল না। শুরুতে আজকের তুলনায় জনবল ছিল অনেক কম। তাদের মাধ্যমে যে অনভিজ্ঞ পদযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে একটি নিজস্ব স্বকীয়তা লাভ করেছে। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের মেশিনারিজ স্থাপন, ভবন, রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে তাদের অনেকেই এখন আর এ প্রতিষ্ঠানে নেই; কেহ কেহ আবার মৃত্যুবরণ করেছেন। বিদায়ী সহকর্মীগণ হয়তো মনে মনে বলেছেন, "বিদায় সহকর্মীরা বিদায়। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে পরপারের কোন মাঠে, তবে এই পৃথিবীতে আর নয়"।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অবধারিত, একে মেনে নিতেই হবে। তবে স্মৃতি বিজড়িত অনেকের পরামর্শ, উপদেশ ও আলাপচারিতা স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। তাদের অলিক ইশারায় আজও এগিয়ে যাই অথচ কাছে গেলেই তারা অদৃশ্যে বিলীন হয়ে যান। তাদের মধ্যে যাদের নাম স্মরণ না করে পারছি না তাদেরই একজন ছিলেন মরহুম এম.এ.বেগ স্যার,যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্প থাকাকালীন এ প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ছিলেন। আমার চাকুরী শুরু এম.এ. বেগ স্যারের পিরিয়ডে। ৬৮,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-তে আমাদের অফিস; একদিন লাঞ্চ করে অফিসে উঠছিলাম এমন সময় আমার এক সহকর্মী আমাকে বললেন,"স্যার মেইন বিল্ডিং-এ চলেন, বড় সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব"। আমি তখনো বড় স্যারকে চিনতাম না,তাই তার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান ভবনের থার্ড ফ্লোরে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এম.এ.বেগ স্যারের চেম্বারে; অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম। অনেক বড় চেম্বার, স্যার এক কোণে বসে আছেন। সালাম দিলাম,স্যার বসতে বললেন। একটু পরেই এ প্রতিষ্ঠানের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের টেন্ডার ওপেনিং শুরু হলো, আর সে উদ্দ্যেশ্যেই আমার সহকর্মী সেখানে গিয়েছেন; তিনি একটি রেজিষ্টার বের করে দিয়ে আমাকে লিখতে বললেন। ও মা! কি লিখবো, আমিতো তখনো এ ধরনের অফিসিয়াল লেখা শিখিনি; তবে না বলার সুযোগই বা কোথায়? রেজিষ্টারের পিছনের লেখা দেখে তদ্রুপ রোল টেনে ঘর করে সম্পূর্ণ লেখা শেষ করে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী বিডারদের স্বাক্ষর নিয়ে কোনমতে বাঁচলাম। টেন্ডার বিডারদের বিদায় হওয়ার পর স্যার জানতে চাইলেন এ টেন্ডারের estimated cost কত? আমি জেনারেল সাইডে কাজ করতাম, estimate সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। তাই উত্তর দিলাম, "স্যার, আমি নতুন জয়েন করেছি"। স্যার বললেন, "কত দিন হয়েছে"; "১৩ দিন" - শুনেই স্যার বললেন, "আর কত দিন নতুন থাকবেন!"। স্যারের সে কথার মধ্য দিয়েই আমি আমার চাকুরী জীবনের দিক নির্দেশনা পেয়েছি এবং আজও তা অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি।

তার আড়াই মাস পরেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম এমডি হয়ে আসলেন কর্ণেল এ. কে. এম. সিকান্দার হোসেন স্যার । এখানে আসার পর তিনি অবসরে গেছেন। সে সময়ে ১১ সদস্যের 'প্রজেক্ট এ্যাডভাইজরী কমিটি'-তে আজকের পরিচালক পর্ষদের মতো কাজের অনুমোদন নেয়া হতো, যার কয়েকটি সভা আমি সিকান্দার স্যারের সাথে কনডাক্ট করেছি। সিকান্দার স্যারও অমায়িক এবং খোলা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি তখনো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সরকারী বাসায় থাকতেন, প্রয়োজনীয় ফাইল স্বাক্ষর করাতে একদিন স্যারের বাসায় গেলাম। ড্রইং রুমে বসিয়ে স্যার পায়েস খাওয়ালেন, আর মৃদু হেসে বললেন,"রান্না ভাল হয়নি? গতকাল বাড়ি থেকে একজন দুধ নিয়ে এসেছেন, আমি নিজে রাতে রান্না করেছি"। আমার চাকুরী জীবনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা তার কাছ থেকে পেয়েছি। তিনিও পরপারে চলে গেলেন। তাদের পরে যে কয়েকজন এমডি এসেছেন এবং চলে গেছেন তাদের সকলের নিকট থেকেই অপরিসীম স্নেহ পেয়েছি এবং বর্তমান এমডি মহোদয়ের স্নেহধন্যে তার সার্বিক নির্দেশনা, পরামর্শ অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছি।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট হতে যেমন স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি, সহকর্মীদের নিকট থেকেও পেয়েছি অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বড়দের শ্রদ্ধা আর সহকর্মীদের স্নেহের বন্ধনে আমরা মিলেমিশে এক পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে আছি। মনে পড়ে ১৯৮৭ সনে দেশে বেশ বন্যা হয়েছিল, ঢাকাতে যে বাসায় থাকতাম সেখানে পানি উঠে গেছে; গাজীপুর আসলাম। আমার থাকার জায়গা প্রয়োজন জানতে পেরে আমার দুই সহকর্মী জনাব মোঃ এনামুল হক জোয়ারদার (বর্তমানে উপ-প্রধান প্রকৌশলী) এবং এস. এম. ছানাউল্লাহ (বর্তমানে ব্যবস্থাপক) তাদের বাসায় জনাব জোয়ারদারের খাট বেড রুম হতে ড্রয়িং রুমে স্থানান্তর করে তার বেড রুমটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের সাথে অনেক দিন একই রান্না খেয়েছি। তাদের সে শ্রদ্ধার ঋণ আজো নিয়ে আছি।

উৎপাদন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন পদের জনবল নিয়োগের কার্যক্রম উইং কমান্ডার সৈয়দ ওয়াহিদুন নবী, মহাব্যবস্থাপক, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস (সিভিল এ্যভিয়েশন থেকে প্রেষণে এসেছিলেন) স্যারের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। জেনারেল সাইডের কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে সে সকল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট রাখা হয়েছিল আমি অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষীয় সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলাম। সৈয়দ ওয়াহিদুন নবী স্যার আমার দেখা অনেক বড় মাপের একজন মানুষ। তাঁর নিকট থেকে অনেক স্নেহ, বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি, যে কারণে তিনি আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর।

[পৃথিবীতে অপরিমেয় সম্পদ অর্জন, অধিক সুখ ভোগ, ঐশ্বর্যের মোহ নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শন ইত্যাদি মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পৃথিবীতে আসা, তারপর সময় ফুরালে একদিন অজানার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া, এটাই বিধাতার অমোঘ বিধান। ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার সেজন্য বলেছেন, "এ পৃথিবী একটা নাট্যমঞ্চ এবং মানুষ কেবলমাত্র সে মঞ্চে অভিনয় করে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়"। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "All that live must die passing through nature to eternity"। তাই আজকের এই দিনে হারানো সহকর্মীদের অকুণ্ঠচিত্তে ও বড়দের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, তাদের অবদান স্বীকার করছি।

বর্তমানে করপোরেশনের কাজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে জনবল; যারা সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি অনুসারে নিরলসভাবে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা যেমন কর্মঠ, কর্তব্যানুরাগী তেমনি তাদের মধ্যে রয়েছে অটুট ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন। তাদের সততা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেধা, নিষ্ঠা ও শ্রমে অনাগত দিনে করপোরেশন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে আর তাতেই স্বার্থক হবে নতুন পুরাতনের সম্মিলনে অনুষ্ঠিত এ মহান মিলনমেলা তথা রজত জয়ন্তী উদযাপন; আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠবে তাদের মন, যারা যে কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, রয়েছেন এবং নিবেদিত থাকবেন এসপিসিবিএল এর কর্মযজ্ঞে।

পরিশেষে এই স্মরণিকা প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, লেখা দিয়ে স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে প্রকাশনা কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি।

--- o ---

আমাদের কাগজেরনোট

মোঃ মুছলিম মিয়া
উপ মহাব্যবস্থাপক

মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তর যুগে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে চালু করেছিল 'পণ্য বিনিময় প্রথা'। হাজারো বছর আগে কেবল বিশ্বাস আর সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবহারিক জিনিসপত্রের এই বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে সভ্যতার বিবর্তনে যখন বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, তখন তাদের নির্ধারিত 'ছাপ অংকিত' জিনিস বা ধাতব খন্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। ধাতব খন্ড উদ্ভবের আনুমানিক একশত বছর পর এই উপমহাদেশে রূপা বা তামার পাতে রাজার প্রতিকৃতি, নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন এবং দেব-দেবীর প্রতিকৃতি অংকিত ধাতব মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। মৌর্য বংশের শাসন আমলের বহু 'ছাপাঙ্কিত মুদ্রা' পাওয়া যায় বগুড়ার মহাস্থানগড়ে (পন্ড্রুনগরে)। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আমলের মুদ্রায় প্রতিকৃতি, জীব-জন্তু বা দেব-দেবীর পরিবর্তে আরবী ও ফারসী ভাষায় সুলতানের নাম-সন তারিখ ইত্যাদি ব্যবহার হয়। তখনকার প্রচলিত বিভিন্ন আকৃতির মুদ্রাগুলোকে 'টংকা বা তানকাই' বলা হতো, এই 'টংকা বা তানকাই' বাংলা ভাষায় টাকা।

চীন দেশে ৭ম শতকে প্রথম কাগজের নোট আবিষ্কার হয় বলে জানা যায়। পরবর্তীতে ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। আনুমানিক ১৩৬৮-১৩৯৯ খৃঃ চীনে কাগজের নোট প্রচলন হয়, তখন কাগজের নোটের নিরাপত্তা হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল সম্রাটের সীল ও কোষাধক্ষের স্বাক্ষর। ইউরোপে বিভিন্ন ধাতব মুদ্রার বিপরীতে ক্যাশ-রিসিপ্ট বা 'Running cash notes' বা চলমান নোটের প্রচলন হয়। চলমান নোটে মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করা হতো এবং শর্ত থাকতো যে, 'প্রদানকারী ডিপোজিটরকে অথবা ইহার বাহককে চাহিবামাত্র উল্লেখিত পরিমাণ মুদ্রা প্রদানে বাধ্য থাকিবে', যা আজও বিভিন্ন দেশ তথা বাংলাদেশের কাগজের নোটে প্রচলিত রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে কাগজের নোট প্রচলন হয়, যার ধারাবাহিকতায় আজকের আধুনিক ও নিরাপত্তা সম্বলিত কাগজের নোট। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' এবং 'গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান' আলাদা-আলাদা ভাবে কাগজের নোট প্রচলন করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' ১৯৭২ সালে

৪মার্চ ১ টাকা ও ১০ টাকার কাগজের নোট প্রচলন করেন। স্বাধীনতার পর বিদেশ থেকে কাগজের নোট মুদ্রণ করা হতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গাজীপুরে 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু হয় আন্তর্জাতিক মানের কাগজের নোট মুদ্রণ। বর্তমানে বাংলাদেশের কাগজের নোট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নোটের ডিজাইনে মুদ্রিত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ। বর্তমান নতুন নোট ২ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত সিরিজ আকারে ডিজাইন ও মুদ্রণ হয়েছে; যার সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে মহান স্বাধীনতার প্রতীক 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ' মুদ্রিত আছে এবং গাঢ় রঙের বিশেষ কালিতে মুদ্রিত আছে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের' প্রতিকৃতি, বর্ডার ও মূল্যমান লেখা। নোটের পেছন দিকে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা মুদ্রিত আছে; ২ টাকা নোটে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রতিক 'কেন্দ্রীয় শহীদমিনার', ৫ টাকা নোটে ঐতিহাসিক 'ছোট সোনা মসজিদ', ১০ টাকা নোটে 'বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ', ২০ টাকা নোটে ঐতিহাসিক 'ষাট গম্বুজ মসজিদ', ৫০ টাকা নোটে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর আঁকা 'মই দেয়া' চিত্রকর্ম, ১০০ টাকা নোটে ঢাকার ঐতিহাসিক 'তারা মসজিদ' ৫০০ টাকা নোটে 'গ্রাম-বাংলা, কৃষক ও নদী-নৌকা', ১০০০ টাকা নোটে 'জাতীয় সংসদ ভবন' মুদ্রিত আছে।

বাংলাদেশে নিজস্ব মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে কাগজের নোট আধুনিকায়ন, জাল-জালিয়াতি রোধে এবং কাগজের নোটের নিরাপত্তা বিধান কল্পে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রচেষ্টা, যোগ হছে নতুন নতুন নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কাগজ তৈরীতেও আস্‌ছে নানা পরিবর্তন; জলছাপ, হলোগ্রাফিক নিরাপত্তা সুতার ব্যবহার, নিরাপত্তা কালি ও অত্যাধুনিক নিরাপত্তামূলক মুদ্রণ ব্যবস্থা।

বর্তমান কাগজের নোট ১০০% কটন এর পরিবর্তে সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত। কাগজের জলছাপে ব্যবহৃত হয়েছে 'প্রতিকৃতি', 'পিকজেল ডট', 'ইলেক্ট্রোটাইপ লগো' এবং সংশ্লিষ্ট 'নোটের মূল্যমান'; আলোর বিপরীতে জলছাপের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। সরু ও সাধারণ নিরাপত্তা সূতার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে কাগজে সেলাইকৃত ৪ মিলিমিটার ও ২ মিলিমিটার চওড়া হলোগ্রাফিক নিরাপত্তা সূতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের 'লগো' ও 'নোটের মূল্যমান' লেখা আছে যা সরাসরি তাকালে সাদা এবং নোটের পাশ থেকে ৯০ডিগ্রী কোণে 'লগো' ও 'নোটের মূল্যমান' লেখা কালো দেখাবে। উচ্চ মূল্যমানের নোটগুলোতে উপরের ডানদিকের কোণায় বিশেষ ধরনের OVI (Optical Variable Ink) কালিতে মূল্যমান লেখা (১০০, ৫০০, ১০০০) মুদ্রিত আছে যা সরাসরি তাকালে একটি নির্দিষ্ট রং এবং তির্যকভাবে তাকালে অন্য একটি নির্দিষ্ট রং দেখা যাবে। নোটের ডান দিকে আড়াআড়ি ভাবে ইনটাগ্লিও কালিতে ৭টি সমান্তরাল লাইন মুদ্রিত আছে যা হাতের স্পর্শে সহজেই অনুভূত হবে। নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য বিশেষ চিহ্ন আছে যা হাত দিয়ে অনুভব করা যাবে। প্রত্যেক নোটেই বিশেষ কিছু স্থানে অতি ছোট আকারে 'BANGLADESH BANK' পুন:পুন: লেখা আছে যা শুধু আতশী কাঁচ দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। নোটের নিচের দিকে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় মূল্যমান মুদ্রিত আছে, যা কেবলমাত্র আনুভূমিকভাবে (৪৫ডিগ্রী কোণে) দেখা যাবে।

'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' এর নিজস্ব মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাংকনোট ডিজাইনের সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম এবং অফিসিয়াল দয়িত্বেই আমি নোটের ডিজাইন করেছি। বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে নোটের ডিজাইন হলেও এবারই ৮টি নোটের ডিজাইন একত্রে এবং নতুন আঙ্গিকে হয়েছে। এই আঙ্গিকের প্রাথমিক নির্বাচনে আমি এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ বহুদিন ধরে কম্পিউটারে কাজ করেছি। নোটগুলোর ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব কিছু আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকনোট ডিজাইনে আমার সম্পৃক্ততা আমাকে গৌরাবান্বিত করেছে। অবসর নেয়ার পরও এই নোটগুলোর মাঝে খুঁজে পাবো আমার অস্তিত্ব, সুখ-দুঃখ আর এক শিল্পী জীবনে এতগুলো নোটের ডিজাইন করার স্বাদ ও তৃপ্তি।

--- o ---

স্মৃতির বিস্মৃতি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের যখন জন্ম হয় তখন আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উপ পরিচালক। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি ১৯৯২ সালের পূর্বে খুব বেশী অবগত ছিলাম না। বাংলাদেশ ব্যাংকের যে উপ পরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের সাথে অফিসিয়াল যোগাযোগ করতেন তিনি ও আমি একই রুমে বসতাম। এই প্রতিষ্ঠানের টালমাটাল অবস্থায় আমি ঐ উপ পরিচালকের অনুপস্থিতিতে একবার পর্ষদ সভায় কার্যবিবরণী সংশোধন করেছিলাম।

মহাব্যবস্থাপক হওয়ার পর আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বগুড়া অফিসে বহাল করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী দু'বছর বগুড়া অফিসে থাকার প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছিলাম। তত্বাবধায়ক সরকার; বিভিন্ন ব্যাংকিং তথ্য 'মেজর, ক্যাপ্টেনের নির্দেশমতো' সরবরাহ করছিলাম। বিভিন্ন ব্যাংক শাখা, প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধন করিছলাম আর নিজের পছন্দমতো ব্যাংক ভবন ও আবাসিক এলাকা সাজাচ্ছি। প্রধান কার্যালয়ের শিথিল নিয়ন্ত্রণে আনন্দের সাথে অফিস চালাচ্ছিলাম। প্রচুর দাওয়াত,-খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছিলাম।

হঠাৎ একদিন ডেপুটি গভর্নর জনাব জিয়াউল হাসান ছিদ্দিকীর ফোন, 'জিয়া, তোমার জন্য সুসংবাদ; ২ বছরের পূর্বেই তোমাকে ঢাকায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে একটি শর্তে তোমাকে টাকশালে কাজ করতে হবে'। আমি মোটেই খুশি হইনি। ওখানে আমি ভালো ছিলাম। কিন্তু আমার বদলী আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তবুও শর্ত দিলাম,'স্যার, আমি রাজি, কিন্তু আমি ঢাকায় থাকবো এবং অফিসের গাড়ীতে আমাকে বিনা পয়সায় আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে'। স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, আমি মামুনকে বলে দেবো'। কিন্তু গাড়ী দেয়া হয়নি; কারণ মামুন স্যার তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক জনাব মজিবুর রহমান আকন্দের মতামত নিয়েই অধিকাংশ কাজ করতেন।

২৭ সেপ্টেম্বর,২০০৭ সালে এখানে ক্রয়-বিক্রয় বিভাগের মহাব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করি। যোগদান করে একটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। মামুন স্যার, আউয়াল স্যারকে রাখতে চান এবং রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় আমি আউয়াল স্যারের সামনে একটি চেয়ারে বসে বহুদিন কাটিয়েছি। তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিন তিনি চা-বিস্কিট খাইয়েছেন। এই অবস্থায় একদিন পর্ষদ সভায় আমি ও আউয়াল স্যার উভয়ই উপস্থিত ছিলাম; সভার প্রারম্ভে গভর্নর মহোদয় জানতে চাইলেন, 'নতুন মহাব্যবস্থাপক যোগদান করছেন না কেন, এখনো আউয়াল কেন'? মামুন স্যার আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে জিয়া, আউয়াল ভাইকে শীঘ্র রিলিজ করবো'। আমি এবং আউয়াল স্যার দু'জনেই অপ্রস্তুত। ঐ সভায় প্রায় সকল মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

আমি এখনাকার কাজ-কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। নোটিং উপস্থাপন ও নিষ্পন্নকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মামুন স্যার থাকতে আমি অনেক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলাম,-কিন্তু পারিনি। এই না পারার পেছনেও মুজিবর রহমান আকন্দ সাহেবের ভূমিকা ছিলো। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকলেই পরিবর্তনের বিপক্ষে অনমনীয় ছিলেন। প্রয়াত বদরুদ্দীন সাহেবের পদোন্নতির স্মারক আমাকে লিখে দিতে হয়েছিলো,যদিও আমি তখন প্রশাসনে ছিলাম না। এক্ষেত্রে মামুন স্যারের সম্মতি ছিলো।

মামুন স্যারের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে বহুদিন কাজ করেছি। কাজেমী স্যার তখন ডেপুটি গভর্নর। একদিন কাজেমী স্যার আমাকে ও মামুন স্যারকে ডাকলেন। আমাদের উপস্থাপিত একটি নথি ধরে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি লিখেছেন? বিহারীরাও এর চেয়ে ভালো বাংলা লিখতে পারে'। বুঝতে পারিনি,কথাটি আমাকে, না মামুন স্যারকে, না উভয়কে বললেন।

মামুন স্যার খুবই নরম প্রকৃতির ভালো লোক। আউয়াল স্যারকে রাখার আগ্রহ ছিলো বলেই সম্ভবত একদিন তিনি আমার, তাঁর গাড়ীতে যাওয়ার আগ্রহকে অগ্রাহ্য করেন। এতে ব্যথিত হইনি; বহুদিন আমি আর মহাব্যবস্থাপক রশীদ গাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট বা কুঁড়িলে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছি; কোস্টারে মাথার উপর রড ধরে দাঁড়ানো আমার বেহাল অবস্থায় রশীদ বিব্রত ও অপ্রস্তুত হয়ে যেতো। সেজন্য সে তার পয়সা খরচ করে আমাকে রিক্সায় করে নিয়ে যেতো।

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলাম। পঁচিশ বছর না হলেও অনেকদিন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাইরে এই প্রতিষ্ঠানে এত দীর্ঘদিন আমার থাকার কথা নয়। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'টি প্যানেল 'নীল' ও 'হলুদ',-ক্লাব, কাউন্সিল,এসোসিয়েশন, কো-অপারেটিভ ইত্যাদির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। 'হলুদ' দল প্রবীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, 'নীল' দল অপক্ষোকৃত নবীনদের। হলুদ দলের প্রভাব,প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা প্রথমদিকে একচেটিয়া ছিল। আশির দশকে আমাকে অফিসার্স কাউন্সিলে (এডি হতে নির্বাহী পরিচালক) নীলদল থেকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেয়া হয়, নীলদল থেকে আমি জিতলাম। 'সভাপতি' পদে নীলদলের এটাই প্রথম বিজয়। হলুদ দলের যিনি হেরে গেলেন তিনি ইতঃপূর্বে পঁচিশটির বেশি নির্বাচন করে সবগুলোতেই জিতেছিলেন। ঠিক তদ্রুপ কো-অপারেটিভের নির্বাচনে আমি নীলদল থেকে প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম।

কো-অপারেটিভে এখনো হলুদ দলের একচেটিয়া আধিপত্য। আমি নীলদলের চেয়ারম্যান ছিলাম, বহুবছর। এগুলো ছেড়ে এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থাকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেকেই বিস্মিত হয়।

আমার মেজোভাইয়ের অসুস্থ্যতার কারণে আমি প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানে থাকার আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। আমার মেজোভাই উত্তরায় থাকেন; ফলে ঢাকা থেকে গাজীপুরে আসা-যাওয়ার পথে উত্তরায় আমার পক্ষে তাঁর খোঁজ-খবর নেয়া সহজ ছিলো। একসময় ছিলো,- প্রতিদিন সকাল ও বিকালে তাঁর বাসায় বা উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে আমাকে যেতে হয়েছে। এসকল কাজে আমি আমার সহকর্মীদের অফুরন্ত সহযোগিতা পেয়েছি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ প্রকাশ করলেও গভর্নর মহোদয় সম্মতি দেননি। আমার সহকর্মী নির্বাহী পরিচালক আহসান উল্ল্যাহ এবং ম. মাহফুজুর রহমানকে দিয়ে গভর্নর মহোদয়কে কনভিন্স করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

আমার এখানে ভাল লাগছেনা, তা নয়। কতগুলো কারণে আমার বাংলাদেশ ব্যাংকে যাওয়া সমীচীন ভেবেছি; প্রেষণে একটি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থাকতে নেই, দীর্ঘদিন থাকলে বিশেষ করে বিভাগীয় প্রধানদের অসহযোগিতা বেড়ে যায়। বিভাগীয় প্রধানগণ অধস্তনদের বলতে থাকেন, 'উনি আর কতদিন, পরে দেখে নেবো'। ফলে আমার কাজে অধস্তনদের অসহযোগিতা বেড়ে যায়। তখন একজন, দু'জন করে অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে বিরোধ হয়; অস্তিত্ব রাখার তাগিদে এরা পেশার একতা বা আঞ্চলিকতার জিকির তোলে। অপরাধীরা কম হলেও এরা একতাবদ্ধ,তাই এদের শক্তি বেশি হয়। দ্বিতীয়ত: আমার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকে গুঞ্জন, 'তিনি আসতে চান না কেন'। এই গুঞ্জন সামান্য কিছু লোকের। আমার ধারণা এরা ঘুষের কথা বলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক জনাব আল্লাহ মালিক কাজেমীকে এই 'গুঞ্জন' সম্পর্কে অবহিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে গভর্নর মহোদয়কে সম্মত করতে অনুরোধ করি। গভর্নর মহোদয় তাঁর কথা এখনো বেশি সমীহ করে থাকেন। 'গুঞ্জন নিয়ে ভাববেননা,আপনাকে আমি চিনি'- কাজেমী স্যারের উত্তর ছিল এমন। তৃতীয়ত, আমাকে ব্যাংকিং জগতের কেউ চেনেন না। একটি অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন ব্যাংকের এমডি,ডিএমডি, চেয়ারম্যানদের মধ্যে একজনকেও চিনি বলে আমার মনে হয়নি; তাঁরাও কেউ আমাকে চেনেননি, এমনকি চেনার কোন আগ্রহও দেখাননি। লক্ষ্য করলাম, তাঁদের অনেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম, জিএমদের সাথে আগ্রহসহকারে কথা বলছেন, অথচ আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করছেন না। এই অবহেলা দূর করার জন্য হলেও আমার বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যার্পন করা প্রয়োজন। তবে মারাত্মক কোন দূর্ঘটনা না ঘটলে প্রত্যার্পন সহজ হবে বলে মনে হয় না। গত বা তার আগের পর্ষদ সভায় গভর্নর মহোদয় আমাকে 'ফেরত না নেয়ার' কথা ঘোষণা দিলেন। ২/৩ জন বাদে সকল বিভাগীয় প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন। থাকার ক্ষেত্রেও আমার কোন জেদ নেই। ডেপুটি গভর্নরও হতে পারলাম না, হলে প্রার্থনার প্রয়োজন হতো না।

এখানে আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, অভিযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। নির্বাহী প্রধান হিসেবে আমাকে অনেক সিদ্ধান্তই নিতে হয় যা অনেকের স্বার্থের অনুকূল নয়। অভিযোগ থাকার ব্যাপারে আমি কখনো বিচলিত নই। এক্ষেত্রে আবার অন্য অভিযোগ হচ্ছে, আমি কঠোর নই। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম বলে প্রশাসনের শাস্তি মওকুফের যেখানে চেষ্টা করেছি, সেখানে নিজ হাতে শাস্তি দেয়া কঠিনই বটে। এছাড়া আমি মনে করি শুধু শাস্তি দেয়ার জন্য আমি এখানে নির্বাহী প্রধান হইনি। আরো লক্ষ্য করেছি, যারা আমাকে কঠোর হতে বলেন, তাদের বা তাদের নিকটজনদের ত্রুটি,অনিয়ম ইত্যাদির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়ায় দরদী হতে বলে থাকেন। আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়ে ব্যক্তিগতভাবে গ্রাসরুট পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেয়াতে অন্য কর্মকর্তারা খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এর কিছুটা সত্যতা আছে। কিন্তু গতবাঁধা বিধিবদ্ধ ধারাকে আমি ভাঙ্গতে চাই। আমি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তকে সমীহ করি; কিন্তু তাঁরা যখন নির্লিপ্ত থাকেন তখন খোঁজ-খবর নিতে বাধ্য হই। এতে পদমর্যাদা নির্বিশেষে অনেক সহকর্মী বিরক্ত হয়ে নানা বিরুপ মন্তব্য করেন। যাদের নিকট এ সকল মন্তব্য করা হয় তারা আবার আমাকে কিছুটা রঙ লাগিয়ে বলে দেন। এ জাতীয় মন্তব্যে গুরুত্ব আমি কখনো দেইনি; দেয়া সমীচীন নয়। আমি মনে

করি, কোথাও কোথাও আমার পরিচালনায় ঘাটতি রয়েছে।

আরেকটি অভিযোগ,-আমি বেশ কিছু সহকর্মীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে চলা-ফেরা করি বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মান-মর্যাদার অবনমন করেছি। এই জন্য 'Four J' এর কথা বলা হয়ে থাকে। 'Four J' হচ্ছেন, জামিল,জামাল, জোয়ার্দার এবং নুরুজ্জামান। আমার ধারনা 'Four J' এর আবিস্কারক আমাদের প্রধান প্রকৌশলী। এটি একটি হাসি-ঠাট্টার বিষয়। এই চারজন ছাড়াও আমি আরও কয়েকজন সহকর্মীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকি, সেলিম দুররানী, ফজলু, সাফায়েত, মাসুম, মুরাদ, সবুর, আজিজ মোল্লা, অহিদুর, টুলু, বিশ্বাস এবং আরও অনেকের সাথে আমি চলা-ফেরা একটু বেশি করি। ব্যাডমিন্টন খেলার সুবাদে এখন দুই বারী, রেজাউল, হাফিজদের সাথেও ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। অধিকাংশ সময় কর্পোরেশনের কর্মকান্ড নিয়ে এদের সাথে আলোচনা করে থাকি। তবে এদের কোন অন্যায় আবদার শুনেছি বলে কোন অভিযোগ নেই। এদের সাথে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সবসময় নাও থাকতে পারে। কাজে অবহেলা হলে ঘনিষ্ঠজনদেরও আমি কড়া কথা বলে থাকি। অভিযোগ থাকা সত্বেও যে কেউ চেষ্টা করলে আমার ঘনিষ্ঠ হতে পারেন; আমার সাথে কেউ বাংলাদেশ ব্যাংকে গেলে এর সত্যতা খুঁজে পাবেন। গত সপ্তাহে একটি মিটিং-এ যোগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েছিলাম; ডেপুটি গভর্নর জনাব আবুল কাশেম তাঁর কক্ষে আমার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করলেও আমি ভাত খেয়েছি অফিসার্স কাউন্সিলের অফিসে পুরাতন সহকর্মীদের সাথে। ঘনিষ্ঠ হয়ে চলা-ফেরা করার অভ্যাস তাই ইচ্ছা করলেও ত্যাগ করতে পারবো বলে মনে হয় না।

আরেকটি অভিযোগ, আমি আলমগীর ও শফিককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিছুটা সত্য। এদের নিকট থেকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামোর বিন্যাস, অতীত কর্মধারার চিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আমি তথ্য সংগ্রহ করে থাকি। অফিসের অনেক প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আলমগীর তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি, এদেরকে পণ্য সরবরাহকারী বিশেষ করে বিদেশী প্রিন্সিপালের স্থানীয় প্রতিনিধিরা চিনে না এবং এরা কখনো পণ্য ক্রয় বা সংগ্রহ নিয়ে একটি কথাও বলেনি। তবে এদের বহু অনুরোধ আমি রাখিনি বা রাখতে পারিনি। এদের সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য একজন বিভাগীয় প্রধান মন্তব্য করেছেন, 'এমডি সাহেব ট্রেড ইউনিয়ন চালু করেছেন'। ফ্ল্যাক্সো মেশিনের মনির ও তাহের মোল্লার অভিযোগ এদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা কমানো উচিত; এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলে শিমুলতলীর ঝুঁকি কমে যাবে। আমি তাদের সাথেও ঘনিষ্ঠ হতে চাই, কারণ তারাও আমার সহকর্মী। মনিরের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিচ্ছি না বলে তার অভিযোগের অন্ত নেই। রিকগনিশন ও রিওয়ার্ড চালু করতে চেয়েছিলাম,পারিনি। এর মাধ্যমে কাউকে পুরস্কৃত করলে অন্যরা নাকি নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকে Recognition & Reward Policy নির্ধারনী কমিটির আমি সভাপতি ছিলাম। কিন্তু এখানে নির্বাহী প্রধান হয়েও এরূপ স্বীকৃতি প্রবর্তন করতে পারছি না। ভালো কর্মী নির্ধারণ করাও কঠিন, যারা করবেন তাদের ন্যূনতম নিরেপক্ষতা থাকা বাঞ্চনীয়।

অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এসে অভিযোগ করেন যে, সবার জন্য করলেও আমি নাকি তার জন্য কিছুই করিনি। মহাব্যবস্থাপক আজহার সাহেবের অভিযোগ, উৎপাদন বিভাগের চেয়ে আমি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করছি না। মহাব্যবস্থাপক কালিমুল্লাকে নাকি আমি বেশি বকি। কথাটা সত্য; এই কর্পোরেশনের আসার পর থেকেই আমি তার সাথে কাজ করছি এবং মহাব্যবস্থাপকদের মধ্যে করিম এবং তাকে আমি নাম ধরে ডাকি। রশীদের কথাটি আলাদা,- তাকে আমার পরিবারের সবাই আশির দশক থেকে চেনে এবং জানে। যাদের সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চলা-ফেরা করি, আমার বিশ্বাস, তারা এই ঘনিষ্ঠতার জন্য দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করে থাকেন। এটি কর্পোরেশনের লাভ। এই ঘনিষ্ঠতার জন্য তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনার অবহেলায় শাস্তি দেয়া হবেনা-এমন ভাবনা সম্ভবত তাদেরও নেই। ডিভাইড এন্ড রুলে আমি বিশ্বাসী নই। সবকথা শুনলেও তদনুযায়ী কাজ করি না। কোন কথা শুনে সাথে সাথে বলে দিই বলে ইদানীং আর কেউ আমাকে অন্যের কথা শুনাতেও আসে না।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর অভিযোগ, আমি অনেক বেশি মেশিনপত্র কেনার সহযোগিতা করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কাজের ক্ষেত্রে তার সাথে আমার পরিচয়। নতুন বছরের শুরুতে কার্ড পাঠিয়ে তিনি এ সম্পর্ক রেখে চলছিলেন। করিম জিএম হলেও তাকে সবাই সচিব হিসেবে চিনে। তারও অভিযোগ ছিলো, আমি কর্মচারীদের সাথে কর্মকর্তাদের এক করে ফেলেছি। এখন অবশ্য সে আর এমন অভিযোগ করে না। আদম আলী সাহেবের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। প্রশাসন বিভাগ থেকে বদলীকে তার সহজভাবে নেয়া উচিত ছিলো। আমার মেজো ভাইয়ের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। প্রধান প্রকৌশলী এখন কোন অভিযোগ করতে চান না- আমার অবসর গ্রহণ বা চলে যাওয়ার পর বলবেন বলে একজন সহকর্মীকে জানিয়েছেন। তিনি অনেকের পরিচয় কুষ্ঠি ধরে বলে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তার জ্ঞান দেখে আমরা অবাক হই। নুরুজ্জামানে 'জে' নেই বলাতে তৎক্ষণাৎ তার উত্তর ছিলো, নুরুজ্জামানে দু'টি 'জে' আছে। প্রায় সকলের এলাকা বা জেলা প্রীতি থাকলেও তিনি বরিশাল প্রীতির কথা প্রকাশ্যে বলে থাকেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে

করপোরেশনের কোন কাজ থাকলে তাকে বললেই তিনি ঐ অফিসের বরিশালের লোক খুঁজে কাজটি সমাধানের চেষ্টা করেন। আমার জেলার লোকজন কম বলে আমি অন্য জেলার সমমনাদের নিয়ে বিশেষ এলাকা বা বৃহত্তর বাংলাদেশ প্রীতির চেষ্টা করে থাকি। তবুও সৈয়দ আহমেদ ও মুমিনুল হকের অভিযোগ, দেশীভাই হিসেবে আমি তাদের গুরুত্ব দিচ্ছ না। দু'জনই সরল প্রকৃতির লোক। অনেকেই বলে থাকেন, আমি কেন ডিসপেন্সারী দূরে নিলাম। ডা: নাহিদকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ প্রথমদিকে ছিলো, এখন সম্ভবত নেই। ক্লাবের সভাপতি করায় ডা: আজম ঠিকমত চেম্বারে বসছেন না বলেও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। বিভিন্ন বিভাগের অভিযোগ, আমি কেন ঠিকাদারের বিল পরিশোধে তাগাদা দিই। উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টায় একজন জিএম নাকি বলেছে, 'উৎপাদন বাড়িয়ে কি আকাশে তুলবেন'? শুধু আমি পরিদর্শনে গেলে মেশিনের স্পীড বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশনা দেয়া আছে বলে শুনেছি।

ভেতরের অভিযোগের চেয়ে বাইরের অভিযোগ অনেক গুরুতর। বাইরের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাকুরীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা পরিচালক পর্ষদের থাকলেও অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ইচ্ছা করলে এমডি চাকুরী দিতে পারেন। ইতঃপূর্বে এমডিরা সম্ভবত চাকুরী দিতে পেরেছিলেন। পত্রিকার বহু রিপোর্টার তাদের পরিচিত একজনের চাকুরী দেয়া হলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবেন না বলে আমাকে টেলিফোনে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু আমি যে তেমন ক্ষমতার অধিকারী নই তা আমার কয়েকজন সহকর্মীর প্ররোচনায় তারা মানতে রাজী ছিলো না। আমারও প্রচুর আত্মীয়-স্বজন গরীব এবং চাকুরী প্রত্যাশী। গ্রামে গেলে শুনতে হয়, 'তুমি এতবড় কর্মকর্তা, এলাকার একটা লোককেও চাকুরী দিলে না কেন?'

মেশিনপত্র বা পণ্য সরবরাহকারী বা তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের অভিযোগ আরও মারাত্মক। প্রতিটি কার্যাদেশ না পেলেই কেউ না কেউ অভিযোগ তৈরি করে। প্রতিটি এজেন্ট প্রতিটি কার্যাদেশ পেতে চায়। কার্যাদেশ না পেলেই মনে করে আমরা কারো পক্ষে কাজ করছি। ভাগ্য ভালো যে, এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্রয় দরপত্রের সর্বনিম্ন দরে হয়েছে। এরা দাওয়াত করে কথোপকথন ও ছবি রেকর্ড করে রাখে। আমি এদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চাই; কারণ কর্পোরেশনের সঙ্কটময় মূহুর্তে অর্থাৎ জরুরী প্রয়োজনে এদের সহযোগিতা ব্যতীত উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখা সহজসাধ্য নয়। এদের আমি আমাদের ব্যবসার অংশীদার মনে করি।

গভর্নর মহোদয়ের অভিযোগ হচ্ছে, তাঁকে আমাদের করপোরেশনের বিষয়গুলোও দেখতে হয়। তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন যে, তাঁর সহানুভূতি না থাকলে ক্রয় নির্ভর উৎপাদনমুখী এই প্রতিষ্ঠান চালানো ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে তাঁর সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি করপোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম এর উপর নজর রাখছেন, মূল্যবান পরমার্শ দিচ্ছেন। তাঁর পরামর্শ এবং পূর্ণ সমর্থনের ফলে করপোরেশনের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নতির সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও যার স্বীকৃতি মিলেছে। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও ছায়ার আচ্ছাদনেই আমরা এ বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে সাহসী হয়েছি। দরপত্রের মাধ্যমে প্রতিমাসে ৫/৬টি ক্রয় প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করার নজির অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে আছে কী না আমার জানা নেই। তাই কষ্ট হলেও তাঁর সমর্থন আমাদের অপরিহার্য। একথাটি অনস্বীকার্য যে, তাঁর আমলে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে পরিমাণ কল্যাণমূলক কাজ হয়েছে তা সম্ভবত: অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি।

এতগুলো অভিযোগ থাকার পরও আমি এখানকার কর্মপরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রায় সকল সহকর্মীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা আমি পাচ্ছি। যাদের ভালোবাসা পাচ্ছি তাদের কথা এখন স্মরণে আসছে না; অবসরে গেলে কর্পোরেশনের সুবর্ণ-জয়ন্তীতে এদের কথা লিখবো। এতজন সুহৃদের নাম ধরে লেখা সম্ভব নয়। মহিলা কর্মচারী-কর্মকর্তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধে আমি বিশ্বাসী। এখানকার কর্মক্ষেত্র জুটি বাধার অভয়স্থান। সংসার এবং চাকুরী-উভয়কূল রক্ষা করতে গিয়ে অনেক ভদ্র মহিলা প্রেম-পিরীতি ভুলে যান্ত্রিক হয়ে গেছেন। অবশ্য পিরীতির ঘাটতি নিয়ে স্বামীদের কোন লিখিত অভিযোগ এখনো পাইনি।

আমার বৌ রুনী এখানে এসে আনন্দ পায়, সেও আমার মতো অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে। এখানকার সকলের আতিথেয়তায় সে মুগ্ধ। আমার ধারণা, সংসারের ঝামেলা থেকে কিছুদিন মুক্ত থাকা এবং আমাকে পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে আসার আনন্দ পায়। আমার মেয়ে ঐশীও এখানে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু অর্ণবকে যখন এখানকার কেউ কেউ অফিসিয়াল বিষয়ে ফোন করে তখন সে ও আমি দু'জনই বিরক্ত হই।

আমার ভালো লাগে যখন কর্পোরেশনের ভেতরের রাস্তাগুলোতে চলা-ফেরার সময় ছোট ছোট বাচ্চারা সালাম দেয়, জিজ্ঞেস করে, 'আঙ্কেল কেমন আছেন'। এদের সবাইকে আমি চিনি না,তারা আমাকে চেনে। আট-দশ বছরের বাচ্চারা যখন ব্যাডমিন্টন খেলার সুযোগ করে দিতে আবদার করে তখন নিজেকে সার্থক একজন এমডি মনে হয়। কলোনীর ছেলেরা যখন আমাকে তাদের ব্যাডমিন্টন,

ক্রিকেট,ফুটবল খেলার সাথী করার আবদার করে তখন নিজেকে সকল অভিযোগের উর্ধ্বে ভাবী। মেয়েরা যখন তাদের ব্যাডমিন্টন কোর্ট করে দেয়ার জন্য বলে তখন এদের নিজের মেয়ের মতো মনে হয়। স্কুলে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলীতে আমার উপস্থিতি তারা টের পায়। তারা বুঝে,আমি জানি কম,কিন্তু জানাতে পারি বেশি।

এদের ঘনিষ্ঠতা ভুলবো কি করে। এদের বদৌলতে এদের মায়েরাও আমাকে চিনে;তারা জেনে সালাম দেন,আমি না চেনে সালাম নিই। বৌয়ের চোখ রাঙ্গানীর ভয়ে বেশি চিনতে পারি না। সহকর্মীরা ভুলে গেলেও আমি সহকর্মীদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই, এদের সাফল্য আমাকে আনন্দ দেবে এবং মৃত্যুর শিয়রে এদের কেউ না কেউ মনের টানে বা পেশাগত দায়িত্ব পালনে থাকবে-এই প্রত্যাশা আমার রইল।

--- o ---

আপনাদের জানা আমার কিছু কথা

খান আব্দুস সোবহান
প্রাক্তন সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

আমি ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "The Security Printing Corporation of Bangladesh Ltd." এর চাকুরীতে যোগদান করি। চাকুরীর মেয়াদ কাল প্রায় ১০ বৎসর ৬ মাস। The SPCBL এ যোগদানের আগে আমি Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) পরিচালক পদে আসীন ছিলাম। ওখানে চাকুরীর মেয়াদকাল ২/১ দিন কম, ২০ বৎসর । ICMAB তে চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে প্রায় প্রতিদিন যাওয়া ছিল নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। আমি যোগদানের পর আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো The SPCBL এর Memorandum of Association (M/A) and Articles of Association (A/A) তৈরি করা হয়। তখনকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা ডক্টর আকবর আলী খান। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন M/A and A/A এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে কোন কাজের জন্য মন্ত্রণালয়, এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। অর্থাৎ The SPCBL হবে স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের মালিকানায় একটি লিমিটেড কোম্পানী। পরিচালনা পর্ষদই হবে সকল নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুল চালিকা শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি SPCBL এর সাথে The শব্দটি লাগিয়ে দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বটা বাড়িয়ে দিলেন। মন্ত্রণালয় আমাকে আরেকটা যে দায়িত্ব দিলো তা হচ্ছে ওখানে শ্রমিক ইউনিয়ন যাতে না থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণের । পরবর্তী কালে সরকার অনেক চেষ্টা করে ওখানে শ্রমিক সংগঠনচ বন্ধ করে দেয়। যার সুফল এখণ কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাই ভোগ করছেন।

যে কোন প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য দরকার ত্যাগী ও দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। The SPCBL এরুপ লোকের কোন অভাব নেই। শীতকালে ভোর ৭ টায় কুয়াশার আধারে কাঁপতে কাঁপতে তরুণ-তরুণীরা উপস্থিত হয়ে যান কর্মস্থলে। এক নাগাড়ে কাজ করে যান শেষ সময় কালটা পর্যন্ত। All well disciplined; যে কোন সমস্যায় একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন একাগ্রচিত্তে। এর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

Bank Note উৎপাদন এলাকায় "ইন্ট্যাগ্লিও" মেশিনটি সবচেয়ে দামী (তখন ১টা মেশিনই ছিল); হঠাৎ একদিন ঐ মেশিনের ১টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অকেজো হয়ে গেল। ঐ যন্ত্রাংশটির মূল্য অনেক। আনতে হবে সুদূর সুইজারল্যান্ড হতে। সময় লাগবে কমপক্ষে এক মাস। দায়িত্ব দেয়া হলো নিবেদিত প্রাণ ২/৩ জন তরুন প্রকৌশলীকে। ঐ প্রকৌশলীবৃন্দ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে পুরানো ঢাকার ধোলাইখাল এলাকা হতে ট্রাকের যন্ত্রাংশ এনে ঐ মেশিনে সংযোজন করে চালু করে দিল ১০০ কোটি টাকার মেশিন। সময় বাচঁলো ১ মাস, আর্থিক সাশ্রয় হলো কোটি টাকা। উৎপাদনের চাকা চালু থাকলো। এতে উৎপাদন ব্যয় কমে গেল কয়েক কোটি টাকা।

আমি যখন কাজে যোগদান করি। তখন মরহুম কর্ণেল সেকান্দার সাহেবের তত্ত্বাবধানে উৎপাদন যথাযথ শুরু হয়েছিল। কিন্ত হিসাব

বিভাগের কাজকর্মে তেমন কোন গতি ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল তাদের পাওনা প্রায় ৮০ কোটি টাকা পরিশোধ করার জন্য।

এ প্রেক্ষাপটে আমরা উৎপাদিত পন্যের মূল্যমান পুনঃ নির্ধারণ,নতুন কার্যাদেশ আনয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে ৩ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব পাওনা পরিশোধ করে দেই। এর ফলে The SPCBL এর ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত ভাবে জমা টাকা অনেক বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালে আমি যখন অবসর গ্রহণ করি তখন স্বীয় আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ কোটি টাকা। পাবলিক সেকটরে একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের এরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ খুবই বিরল। এ সকল কিছুর কৃতিত্ব এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। The SPCBL পাবলিক সেক্টরের এক অনন্য উদাহরণ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রেও। এখন তো ডাটাবেজ কম্পিউটারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সে সময়কালে তা কাগজে কলমে, শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেনা পাওনার হিসাব এত আপ টু ডেট ছিল, যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরী ছেড়ে গেলে ৪ কর্মদিবসের মধ্যে সব পাওনা পরিশোধ করা যেত। তা ছাড়া অন্যান্য পাওনাদারদের পাওনাও পরিশোধ করা হতো যথানিয়মে ও যথাসময়ে।

The SPCBL এ চাকুরী কালে পদাধিকার বলে আমি বোর্ডের সচিবের দায়িত্বও পালন করেছি। সে সুবাদে বোর্ডের সভাপতি গভর্ণর মহোদয়ের সাথে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল। সেটা কাজে লাগিয়ে ওয়েলফেয়ার ফান্ড সৃষ্টি, বর্জ্য বিক্রির টাকা কল্যাণ তহবিলে প্রদানের নিয়ম এবং কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাতে বিনা চিকিৎসায় না মারা যান সে জন্য চিকিৎসার সব ব্যয়ভার এ কল্যাণ তহবিল হতেই যোগান দেয়া হতো। তাছাড়া নীট লাভের ৫% সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ দেয়ার সরকারী আইনের বাস্তবায়নের কাজটাও যথা সময়ে করার উদ্যোগ নিয়ে সফল হই। এ সকল ব্যাপারেই আমি তখনকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি।

বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা প্রবাদ পুরুষ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব লুৎফর রহমান সরকার শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তার বদান্যতায় The SPCBL এর প্রাথমিক স্কুলটি, জুনিয়র স্কুলে ও পরবর্তীতে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। এর ফলে এর প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের অন্য স্কুলে যেতে হয় না।

এত ভাল কথা বললাম, এখন কিছু কিছু অপছন্দের কথা বলতে হয়। এ প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের বাতিলের আগে দুটো ইউনিয়ন এবং দুটোর সভাপতি ছিল দুজন ড্রাইভার। গড ফাদাররা অল্প বৃদ্ধির এ লোক দুটোকে নানা রকম অপকর্মে ব্যবহারে কখনো কুণ্ঠিত হতো না। যার ফলে আমি যখন সুইজারল্যান্ডে ছিলাম তখন হারানো যায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার ১ টা বান্ডিল। কতিপয় শ্রমিক নেতা পুলিশের কাছে বলে আসে, আমি এর সাথে জড়িত। এ থেকে রেহাই পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক সময় দেখেছি কোন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সরাসরি দুর্নীতি দমন কমিশনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অনেককে নাস্তানাবুদ করেছেন।

যাই হোক টাকশাল থেকে অবসর গ্রহণের পরে হজ্ব করতে গিয়েছিলাম ২০০২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ফিরে আসি ১৫ ই মার্চ ২০০২ এ। বর্তমান চাকুরীস্থল Credit Rating Information and Services Ltd,(CRISL) মহাব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করি মার্চের ১৭ তারিখে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১১ বৎসর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছি আগেরকার মত নিষ্ঠার সাথে। বয়স হয়েছে শরীর বিশ্রাম চায়। তাই এ কর্মস্থল হতে বিদায় নিতে চাই সসম্মানে। পরকালের পথে পাড়ি দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই আপনাদের সবার দোয়া কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

--- o ---

করপোরেশনে কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিক অংশ গ্রহণ) আইন ১৯৬৮ বাস্তবায়নের গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতিকথা

খাজা আব্দুল মোমেন
প্রাক্তন উপ-মহাব্যবস্থাপক

আমি ১৯৮৮ সালে খুলনাস্থ বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ এর উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ বর্মকর্তা পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অধিকতর উন্নতি ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনে সমমর্যাদা সম্পন্ন উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) পদে যোগদান করি। উক্ত সময় ছিল প্রতিষ্ঠানের শৈশবকাল এবং ঐ বৎসর থেকেই পরীক্ষামূলক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এমতাবস্থায় আমার দৃষ্টিতে বহুবিধ সমস্যা ধরা পড়ে, তাঁর মধ্যে বড় সমস্যা ছিল আর্থিক দৈন্যতা। তাই কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অন্যান্য বিভাগের সহযোগীতায় একবারে উৎপাদন শুরুর পর থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে (ছয়) বৎসরের ব্যাংক নোট বিল বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত হয়। এর ফলে করপোরেশ ৩২ কোটি টাকা পায় এবং আর্থিক দৈন্যতা অনেকাংশে দূর হয়ে স্বচ্ছলতার দ্বার উন্মোচিত হয়।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত করপোরেশনে অর্জিত উৎপাদন, বিক্রয়ের পরিমান এবং আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বর্তমানের মত প্রচুর আর্থিক সুবিধা দিতে পারে নাই কিন্তু যুবক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যথেষ্ট উদ্দীপনার সাথে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশার দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। উক্ত সময়ে আমি লক্ষ্য করেছি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থিক দৈন্যতা এমন ছিল যে কেউ কেউ চিকিৎসা খরচ নির্বাহ করতে পারতেন না। আমি এসব বিষয় অবলোকন করে আমার প্রাক্তন কর্মস্থলের ন্যায় কোম্পানী মুনাফা আইন, ১৯৬৮ প্রবর্তনের কথা চিন্তা করি।

কোন প্রতিষ্ঠানে কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিক অংশ গ্রহণ) আইন বাস্তবায়নের জন্য যেসব শর্ত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধিমালাতে উল্লেখ আছে তা করপোরেশনে বর্তমান থাকার প্রেক্ষিতে আমি একজন পেশাদার হিসাব বিজ্ঞানী হিসাবে উল্লেখিত আইন বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে প্রথম অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করি। এ সময় অর্থ্যাৎ ১৯৯৭ সালে সর্বজনাব সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, শেখ মোঃ শোয়েব নাজির ও মোঃ হাবিবুল্লাহ সবাই উপ-ব্যবস্থাপক পদে এবং জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক বাজেট অফিসার পদে অর্থ ও হিসাব বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তারা সবাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত ও যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। আমি সর্বপ্রথম জনাব মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ, তৎকালীন ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর সাথে আলোচনা করি। তিনি এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করলেও ভবিষ্যতে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। এরপর অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা করি। এ প্রেক্ষিতে জনাব আমজাদ হোসাইন বিধি উল্লেখপূর্বক বর্ণিত আইন বাস্তবায়নের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে আমি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক ৬/৭ পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রতিবেদনসহ নথি উপস্থাপন করি। জনাব খান আব্দুস সোবহান নথিটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণের পরে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোন দিক নির্দেশনা দেন নাই। এর পরে ১৯৯৮-৯৯ সালের প্রভিশনাল হিসাব প্রস্তুতের সময় মুনাফা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থের প্রভিশন করা হয়। এ বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের কক্ষে জনাব খান আব্দুস সোবহান কোম্পানী নিরীক্ষকের প্রতিনিধি হিসাব বিভাগের একজন কর্মকর্তা এবং আমার উপস্থিতিতে আলোচনা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মুনাফা আইন মোতাবেক বরাদ্দ রাখার নির্দেশনা দেন। যথাসময়ে নিরীক্ষিত হিসাব পরিচালক পর্ষদে উপস্থাপনের পরে তা অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত হিসাব অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মুনাফার অংশ বিতরণের লক্ষ্যে অর্থ ও হিসাব বিভাগ থেকে স্মারকলিপি উপস্থাপিত হলে পরিচালক পর্ষদ কর্মচারীদের কারা উৎপাদন বোনাস এবং কারা আইন অনুযায়ী মুনাফার অংশ নেবে এ ব্যাপারে করপোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এর ফলে বিষয়টি প্রশাসনিক বিভাগের আওতায় চলে যায় এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলতে থাকে। এর পরে জনাব মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দের পরামর্শে প্রশাসন বিভাগ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ আলীর পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়। তিনি কর্মচারীদেরকে উৎসাহ বোনাস এবং আইন অনুযায়ী মুনাফার অংশ উভয়ই প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশাসন বিভাগ তদনুযায়ী পরিচালক পর্ষদে স্মারকলিপি উপস্থাপন করলে পর্ষদ কর্মচারিদেরকে উভয়ই যুগপৎভাবে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করেন। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর

যাবৎ অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগ, পরিশ্রম আর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে পরিচালক পর্ষদ কোম্পানী মুনাফা আইন বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রদান করেন। আমি ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানে কোম্পানী মুনাফা আইন বাস্তাবায়নের স্বপ্ন দেখেছি যা ১৯৯৯ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা আমার প্রশান্তি আর আনন্দের কারণ। আমিএখন সবার কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করছি এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের উন্নতি কামনা করছি।

--- o ---

টাকশালের স্মৃতি কথা

মাহমুদা খাতুন
প্রক্তন উপ-প্রধান ডিজাইনার

আমি আর্ট কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে বি,এফ,এ, ডিগ্রী পাশ করে করাচীর মালির হল্টে পাকিস্তান সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ১৯৬৮ সালের জুলাই, ২ তারিখে সিনিয়ার ডিজাইনার পদে যোগদান করি।

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের পরে পাকিস্তানে জেল খেটে ১৯৭৩ এর অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে এসে সেক্রেটারিয়েট এর এস্ট্যাবলিশমেন্ট ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করি। এর কিছুদিন পর আমিসহ আরও ৫ জনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সারপ্লাস হিসেবে পাঠায়। আমরা ৬ জন জনাব ফজলুল করিম (ডিজাইনার),রফিউদ্দিন আহমেদ (ডিজাইনার) আমি মাহমুদা খাতুন (ডিজাইনার), জনাব আবুল খায়ের (এনগ্রেভার), জনাব আলতাফ হোসেন (প্রিন্টার) ও জনাব শাহ আলম (প্রিন্টার)।

অর্থ মন্ত্রণালয়ে কতকালই বা থাকা যায়, তখন জনাব ফজলুল করিম, রফিউদ্দিন ঠিক করলেন, বাংলাদেশেই একটা সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস তৈরি করা হলে আমাদের একটা সঠিক গতি হয়। তখন সেক্রেটারী পর্যায়ে তাঁরা এ বিষয় উপস্থাপন করেন। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত, হয় বাংলাদেশ ব্যাংকই এই দায়িত্বভার বহন করবে। এরপর ঠিক হলো, গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানার পাশে অনেক জায়গা থাকায় সেখানেই জমি কিনে এটা করা যেতে পারে।

ইতোমধ্যে ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে আমাকে গর্ভমেন্ট নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ে যোগ দিতে হয়, যা বিজি প্রেসের অধীনে ছিল। এখানে আমি ডিজাইন সুপারভাইজার পদে যোগদান করি এবং আমি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রসেস এর সকল দিক, যেমন ডিজাইন থেকে শুরু করে স্টুডিওর কাজ, প্লেট তৈরী, ছাপা ছাড়াও এস্টিমেট করা, বিল করা সবই দায়িত্ব পালন করে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

ঐ সময়ে আমাকে ছাড়া সকল ডিজাইনার ও এনগ্রেভারদের বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা কক্ষে ডিজাইনের কাজ শুরু হয়। কিন্ত তখন টাকা ছাপা হতো ব্র্যাডবেরি উইলকিনসন প্রতিষ্ঠান (ইংল্যান্ড) থেকে।

১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিয়ে লিয়েন নিয়ে যোগদান করি ডিজাইনার পদে। কারণ জনাব ফজলুল করিম (ডিজাইনার) হঠাৎ বিদেশ চলে যান চাকুরী নিয়ে, আর তখনই ঐ পদ খালি ছিল বলে আমাকে নেয়া হয়। তখন আমরা ৩ জন থাকি বাংলাদেশ ব্যাংকে। আমি যোগ দেওয়ার পর কাজ শুরু হয়, দিলকুশা বিল্ডিং এ। এবার কাজ আসে ৫০ টাকার নতুন ডিজাইন বানানোর জন্য, সবাই আমরা ডিজাইন বানাই, আমার ডিজাইন, সেট অনুমোদন পেয়ে কোরিয়াতে প্লেট বানানোর জন্য চলে যায়।

আমি যখন তেজগাঁও প্রেসে ছিলাম তখন ডিজাইনার রফিউদ্দিন আহমেদ ও এনগ্রেভার আবুল খায়ের সাহেবদের সুইজারল্যান্ড-এর ডিলা, রু, জিওরি (প্রিন্টিং মেশিন সাপ্লায়ার) তে দায়িত্বে ট্রেনিং এ পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক। আমি ১৯৮৫ সালে যোগদান করার ২ বছর পর আমাকে জনাব মুছলিম মিয়ার সাথে সুইজারল্যান্ডে পাঠানো হয়। আমি সেখানে ১০ মাস প্রশিক্ষন নিয়েছি, মুছলিম মিয়া ১ বৎসর।

এর মধ্যে টাকশালের জন্য নির্ধারিত জায়গায় যাঁরা থাকতেন তাড়াতাড়ি তারা জমির বেশী মূল্য আদায়ের অভিপ্রায়ে লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশের চটি দিয়ে ছাদ ঢালাই করে কোনভাবে একটি ঘর দাঁড় করে।

জমি অধিগ্রহণ নেয়ার সাথে সাথে প্রিন্টিং মেশিনের অর্ডার দেয়া হয় ডিলারুজিওরিকে। তাঁরা ইটালির মিলানো থেকে মেশিন সাপ্লাই করেণ। মেশিন আসার পর মেশিন ফিটিং শুরু হয়, নতুন প্রেস বিল্ডিং এ। এ কাজে নাজমূল হাসান (ইঞ্জিনিয়ার) বিপুল উৎসাহে জনাব মাইদুল ইসলাম (চীফ ইঞ্জিনিয়ার) এর অধীনে কাজ করেন। বিল্ডিং এর সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা হয় ভারতের ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে।

এ সময়ে আমি আর মুছলিম মিয়া ট্রেনিং এ ছিলাম। মুছলিম মিয়াকে সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালে নিয়োগ দেয়া হয়। তারপর আমরা দুজনেই যাই সুইজারল্যান্ডের ল্যুজান শহরে প্রশিক্ষণ নিতে। আমি ল্যুজান শহরে, মুছলিম মিয়া ইটালির রোম শহরে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে আমি দেশে ফিরে আসি।

ইতোমধ্যে প্রেস বিল্ডিং এর সাথে আবাসিক ব্যবস্থাও করা হয়। এ টাইপ এম,ডি, মহোদয়ের জন্য, বি টাইপ-জি,এম, ও ডি,জি,এম, এর জন্য, সি টাইপ ম্যানেজার ও ডিপুটি ম্যানেজারদের জন্য, ডি টাইপ সহকারী ম্যানেজার ও অফিসারের জন্য ই ও এফ টাইপ অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে জানলাম আমার জন্য সি-২ দোতলা বরাদ্দ হয়েছে। আমি সেখানে শিফট করি। আবাসিক এলাকায়, এ টাইপ বাসায় এম,ডি, কর্ণেল সেকান্দার হোসেন থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুব মিশুক। তিনি সব কর্মকর্তা স্ত্রীদের নিয়ে একটা কমিটি করেন। আমরা খুব মজা করতাম। প্রতি মাসে চাঁদা তুলে একজন করে রান্না করেন, সবাই মিলে সেই রান্না শিখতাম আর মজা করে খেতাম। আবুল খায়ের সাহেবের স্ত্রী আর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্ত্রী দুজনেই খুব ভাল রান্না করতেন। প্রতি বছর বিজয়ের মাসে অফিসের স্পোর্টস, অনুষ্ঠান, খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এসব হতো, তাতে পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপা শুরু হয় প্রথমে ১০ টাকার ব্যাংকনোট দিয়ে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন, যে যে ১০ টাকার নোট কিনতে চায় তাদের দেয়া হবে। আমার ভাগ্যে পড়েছিল ১০/ টাকা ক ০০০০১০৩ নম্বরের। টাকাটা এখনও আমার কাছে আছে, অন্যান্য সংগ্রহের সাথে। আমি ১৯৯৪ সালে অবসরে যাই, কিন্ত ১৯৯৬ সনে আমাকে আবার ডাকা হয়, তারপর আরও ৬ বৎসর ওখানে কন্ট্রাক্টে কাজ করি। চূড়ান্তভাবে অবসরে চলে আসি ২০০২ সালে। এই সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের ২৫ বৎসর পূর্তিতে আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

--- o ---

স্মৃতি চারণা

মোঃ জামিল আখ্‌তার শাহ্‌জাদা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

অফিসে বসে সবচেয়ে ঘনিষ্ট এক সুহৃদের সাথে আলাপকালে করপোরেশনের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরনিকায় স্মৃতিচারণমূলক কিছু একটা লিখা দেয়া উচিত বলে জানাই। কিন্তু জীবনে কখনো গল্প, উপন্যাস বা কবিতা কিছুই লিখিনি বলে কিভাবে এর শুরু করা যায় বলতেই তিনি মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। সেই ধারণার সুত্র ধরেই আমার এই লেখা।

শুরুতেই একটা কথা বলে রাখা ভাল, করপোরেশনের ব্যাংকনোট প্রিন্টিং মেশিনসমূহ সংস্থাপনকালে সংস্থাপন কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে বেশ কিছু বিদেশীর সাথে নিবিড়ভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম উন্নত বিশ্বের মানুষ আমাদের মত দেশের মানুষকে কিরূপ বাঁকা চোখে দেখে থাকে। তাদের ভুল সিদ্ধান্ত ও আমাদের উপর চাপানোর প্রবণতা তখনো ছিলো এবং এখনো আছে; কিন্তু এই বিষয়টি আমার বিবেক, আমার অহংবোধকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। তাই আমি কোন বিদেশীর কথা বা যুক্তি সাথে সাথে গ্রহণ না করে আমাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করি। এ কারণেই আমি

করপোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে মেশিনারী প্ল্যান্টের অনেক ক্ষেত্রে দেশে প্রাপ্ত কাঁচামাল/যন্ত্রাংশ/প্রযুক্তির ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি এবং এক্ষেত্রে আমার সহকর্মীগণকেও উৎসাহিত করেছি। আমার এই অহংবোধ থেকেই নিজস্ব চিন্তায় দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বেশ কিছু modification করেছি। এজন্য আমাকে অবশ্য অনেকের বিরূপ মন্তব্য ইশারা, ইঙ্গিতে শুনতে হয়েছে। এতে কিন্তু আমি কখনো হতোদ্যম হইনি।

১৯৮৭ সালের একটি ঘটনা চাকুরী জীবনের প্রতিটি কাজে আত্মবিশ্বাস যোগাতে আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একদিন; হঠাৎ টেলিফোনে জানা গেল ব্যাংকনোট প্রিন্টিং হলের একটি মেশিনে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। নতুন মেশিন, বছরও গড়ায়নি, এরই মধ্যে এক্সিডেন্ট! ঐ মূহুর্তে আমি ব্যস্ত ছিলাম ও.এস.পি প্রিন্টিং-এর একটি মেশিনে। বাস্তবে দেখার জন্য তড়িঘড়ি করে ও.এস.পি হতে ব্যাংকনোট প্রিন্টিং হলে গেলাম। হলে ঢুকতেই চোখে পড়ল এক বিদেশীসহ তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্ণেল (অবঃ) এ. কে. এম. সিকান্দার হোসেন, সাথে উৎপাদন ও প্রকৌশল বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ SS-2 মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আশেপাশে প্রিন্টিং হলের অন্যান্য মেশিনের জনবল জটলা পাকিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে মেশিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেশিনের দুর্ঘটনা দেখে মনে হলো, আমার ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছে। ৩/৪ টি গ্রিপার বার খুলে ও ডেলিভারী চেইন ছিঁড়ে পাইলবোর্ডে ও মাটিতে পড়ে আছে, দ্বিতীয় ডেলিভারী পাইল বোর্ডের কিয়দংশ ভাঙ্গা। ইঙ্কিং ইউনিট সরানো হলে দেখা গেল ডেলিভারী সিষ্টেমের সম্পূর্ণ ড্রাইভ ইউনিট ভেঙ্গে নিচে পড়ে আছে। ঐ সময় অত্র করপোরেশনে অবস্থানরত তৎকালীন De La Rue Giori (DLRG) বর্তমানে KBA-NotaSys এর কন্সালট্যান্ট Mr. Kasem Chitta Asawachinda (থাইল্যান্ডের নাগরিক) অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাগণের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি মেশিনের ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের বেশ কিছু ছবি তুললেন। মেশিনে যাতে কেউ হাত না লাগায় এ বিষয়ে সাবধান করে তিনি DLRG হতে বিশেষজ্ঞ এনে পরীক্ষা করিয়ে মেশিন মেরামতের প্রস্তাব দেন। তখন আমি সবেমাত্র একজন অনভিজ্ঞ সিনিয়ার উপ-সহকারী প্রকৌশলী; ব্যতিক্রমী এ সকল মেশিনের উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ না থাকলেও অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চিত ছিল বিদেশী সংস্থাপকদের সাথে প্রিন্টিং মেশিনগুলো সংস্থাপনের সরাসরি কাজের ধারণা। অন্যদিকে আমার উর্ধতন কর্মকর্তা সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী সকলেই বিদেশে মেশিন প্রস্তুতকারকের তত্তাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অথচ সকলেই বিদেশী কন্সালট্যান্টের প্রস্তাবে মৌনতাবলম্বন করেন, মনে হয়েছে সায় দিলেন। এভাবে একজন বিদেশীর প্রস্তাবে তাদের মৌন থেকে সম্মতি দেয়ার বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে মর্মাহত করে। আমার মনে হয়েছিল, আমরা চেষ্টা করলে নিজেরাই মেশিনটিকে কার্যক্ষম করতে সক্ষম হবো। কিন্তু কোন প্রস্তাব দেয়ার ক্ষেত্রে আমার কতকগুলো সীমাবদ্ধতা ছিলো; ইংরেজীতে কথপোকথনে সপ্রতিভ নই, উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্যে আমি বয়স ও পদ মর্যাদায় কনিষ্ঠ, অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি নেই ইত্যাদি। তবুও সাহস করে প্রস্তাব করলাম যে, মেশিন মেরামতের জন্য প্রস্তুতকারীর সহায়তা পেতে হলে মেশিনের স্পেয়ার্সের নম্বর, নাম ও বিবরণসহ পূর্ণাঙ্গ ড্রইং প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কন্সালট্যান্ট সাহেব আমার কথার কোন গুরুত্বই দিলেন না, উর্ধতন প্রকৌশলীগণও নিশ্চুপ রইলেন। আমার প্রস্তাবে কন্সালট্যান্ট সাহেব রাগত স্বরে বিবরণসহ ড্রইং এর প্রয়োজন হবে না বলে আমাকে জানালেন। এতে আমি খুব লজ্জা পেলেও আমার জেদ বেড়ে গিয়েছিল। কন্সালট্যান্ট Mr. Kasem Chitta অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে প্রিন্টিং হল হতে প্রস্থান করার প্রাক্কালে আমি তৎকালীন উপ-প্রধান প্রকৌশলী জনাব নাজমুল হাসানকে পিছানোর ইঙ্গিত করি। আমার ইশারা বোধ হয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ও বুঝেছিলেন। দেখি তারা দুজনই পিছনে খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। আমি সাহস করে দুজনকে বললাম, "স্যার, DLRG 'র সাথে যোগাযোগ করে মেশিন ভাল করতে হলে তো অনেক সময়ের ব্যাপার, ২/৩ মাসও লাগতে পারে। আপনারা সাহস দিলে আমরা মেরামতের চেষ্টা করতে পারি।" মনে হলো নাজমুল হাসান স্যার বোধ হয় এ ধরনের প্রস্তাবই আশা করেছিলেন; তাই তাঁরা আমার আগ্রহ দেখে সাথে সাথেই সম্মতি দিলেন। Mr. Kasem Chitta কে ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আমাদেরকে এ কাজের জন্য করণীয় যা প্রয়োজন তা দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করলেন। কাজটি তখনই শুরু করতে নির্দেশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে অগ্রসরমান দলের দিকে গেলেন। নাজমুল হাসান স্যার কাজটি কিভাবে শুরু করা হবে এবিষয়ে আলোচনা করে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে চলে গেলেন। এরপর শুরু হলো কাজ।

যন্ত্রকৌশল শাখার ৬/৭ জনকে নিয়ে প্রিন্টিং হলে মেশিনের কাছে এলাম। জটিল, কঠিন কাজ করার বাসনা করা যতটা সহজ বাস্তবায়ন করা ততটা সহজ নয়। নতুন মেশিন, মেজর এক্সিডেন্ট, অপরিচিত প্রযুক্তি- কিভাবে শুরু করবো তা ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকা যন্ত্রাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম। প্রথম ২/৩ দিন শুধু মেশিনের ভেঙ্গে যাওয়া যন্ত্রাংশগুলো মেশিন হতে বিচ্ছিন্ন করতেই লেগে গেল। এরপর যন্ত্রকৌশল ওয়ার্কশপে ক্ষতিগ্রস্থ যন্ত্রাংশসমূহের পরিস্কার ও মেরামত করতে আরও প্রায় ৫/৬ দিন লেগে গেল। সব কাঁচামাল ও স্পেয়ার পার্টস্ ঐ মূহুর্তে ষ্টোরে মজুত থাকলে হয়তো ২/৩ দিনেই কাজগুলো সম্পন্ন করা যেত। ৭/৮ দিন পর মেশিনে

প্রকৌশলগুলো সংস্থাপনের কাজ শুরু করলাম। সম্ভবত ১০ম দিনে প্রায় সব যন্ত্রাংশ লাগানো হলে দেখা গেল চেইন ড্রাইভ ইউনিটের টাইমিং মিলছে না। শ্যাফ্‌ট ও ড্রাইভ স্প্রোকেট আটকে রাখার মূল পিনটি ভেঙ্গে গেছে। স্বাভাবিকভাবে ভাঙ্গলে তা কষ্ট হলেও বাহির করে পরিবর্তন করা যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে ভাঙ্গা পিনের উপরে স্প্রোকেট অনেকবার ঘুরে শ্যাফ্‌টের সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। টাইমিং করতে হলে সম্পূর্ণ শ্যাফ্‌ট মেশিন হতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে; যা ঐসময় আমাদের দ্বারা করা অসম্ভবই বলা যায়। বিকল্প ব্যবস্থায় এই কাজ করতে হলে প্রথমে স্প্রোকেট প্রায় ইঞ্চি ছয়েক সরাতে হবে। তাও ছিল দুরূহ। এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার কথা তখনও ভাবিনি। নাজমুল হাসান স্যারসহ সবাই ভাবতে লাগলাম, কিভাবে স্প্রোকেট সরানো যায়। ভাবনার পাশাপাশি যার যে ভাবে চিন্তা এসেছে ঐ ভাবেই দু'দিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় দিনশেষে বিষন্ন মনে ঐদিনের মত কাজ শেষ করলাম।

আমাদের এই প্রয়াসে অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি; তারা নিশ্চিত ছিলো, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এইরূপ ধারণা হতেই পারে। আমরাও আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। কিন্তু প্রিন্টিং হল ও অন্যান্য শাখার কয়েকজনের কিছু বিরূপ মন্তব্য আমাকে খুবই মর্মাহত করেছিল। এখনো আমার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের প্রচেষ্টায় অনেকে কৌতুক করেন। এতে আমার কাজের আগ্রহ বাড়ে, জেদ হয়। এই আগ্রহ এবং জেদের জন্যই আমি কোথাও কোথাও ব্যর্থ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমার কয়েকজন সহকর্মীর আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি এবং পাচ্ছি। তৎকালে করপোরেশনে এখনকার মতো সিলিং অতিরিক্ত অতিকালীন কাজের পদ্ধতি দূরের কথা; স্বাভাবিক অতিকালীন কাজের কোন ভাতা ছিলনা। তাসত্বেও আমরা কয়েকজন প্রায় অসম্ভব একটি কাজ সম্ভব করার প্রত্যয়ে একনাগাড়ে বিরামহীন কাজ করেছিলাম।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি ঐদিনের ব্যর্থতায় ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম; পরিশ্রান্ত বলে গভীর ঘুম, ঘুমের মধ্যে চলমান এই কাজ নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখলাম, ঐ মেশিনেরই ডেলিভারী চেইনের একটি অংশ আমাদের ওয়ার্কশপের টুলসের সাথে লাগিয়ে স্প্রোকেট ঘুরাচ্ছি। খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপ্নের দৃশ্য মনে হওয়ায় উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় আর ঘুমাতে পারলাম না। সকালে প্রিন্টিং হলে ঢুকেই প্রথমে চেইনের অংশ পরীক্ষা করলাম; মনে হলো স্বপ্নে দেখা মতে কাজ করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। হাসান স্যারকে জানালাম, তিনিও সমাধান হতে পারে বলে আশ্বস্ত করলেন। আশ্চর্য! স্বপ্নের দেখা প্রক্রিয়ায় কাজ করে অবশেষে স্প্রোকেট সরানো হলো, পিন বের করা হলো। সম্ভবত ১৩ তম দিনে সব কিছু সংস্থাপন করতে করতে বুঝতে পারছিলাম মেশিন ঠিক হতে চলেছে। আনন্দে দুপুরের খাবারের জন্য সময় নষ্ট করতে মন চাচ্ছিল না। বাহিরের দোকান হতে বনরুটি ও কলা এনে খেয়ে ক্ষধা মিটালাম। দু'বার মেশিনের ট্রায়াল রান করলাম; সাফল্যের আনন্দে আমার চোখে অশ্রু এসে পড়েছিল। বিকেল ৩:৩০ মিঃ নাগাদ উর্ধতন কর্মকর্তাগণকে খবর দিয়ে আনা হলো। সকলকে নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মেশিন রান করানোর সুইচ টিপে মেশিন সচল করলেন।

চাকুরী জীবনের প্রারম্ভে অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বেই এধরনের একটি জটিল মেরামত কাজ সার্থকতার সাথে সম্পন্ন করতে পারার আনন্দে সকলে দারুণভাবে উদ্বেলিত হয়েছিল। পরে জানতে পেরেছিলাম একাজের জন্য DLRG হতে ৪০,০০,০০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার একটি ইনভয়েস প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশ্য উক্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৮৭ সালে পরিচালক পর্ষদের সম্ভবত ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যন্ত্রকৌশল শাখার আট জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

--- o ---

যা মনে পড়ে

মোঃ হাবিবুল্লাহ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ক্ষণস্থায়ী, কৌতুহলী এবং রহস্যময়ী এই পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার যেন শেষ নেই। সৃষ্টির চিরাচরিত ও প্রচলিত নিয়মের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত স্মৃতিগুলোকে ভুলে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই তৎকালীন বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (সহকারী ব্যবস্থাপক) হিসেবে যোগদান করি। দেশের সকল কারেন্সী ও ব্যাংক নোট উৎপাদন হয় এই রকম একটি নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে নিজেকে সত্যিই গর্বিত মনে করছি। এখানে যোগদানের পর থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ আমার চাকুরী জীবনের প্রায় চব্বিশ বছরের অনেক স্মৃতিগুলো আমৃত্যু স্মরণে থাকবে।

আমরা যখন ১৯৮৯ সনে কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রায় ২০/২১জন ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাই, সে সময়ে আমাদের নতুনত্ব ও আনন্দের আমেজটাই ছিল অন্যরকম। আমি যোগদান করেই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োজিত হই। উৎপাদন এলাকায় এক, দুই ও দশ টাকার ব্যাংক নোট উৎপাদন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই।

১৯৮৯ সনে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের উৎপাদন এলাকা ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্বটি পড়েছিল আমার উপর। নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন উৎপাদন এলাকা ঘুরে যখন ব্যাংকনোট ফিনিশিং হলে ঢুকে এক, দুই ও দশ টাকা মূল্যমানের নোটশীট কাটিং ও পরীক্ষণ এবং গণনা কাজ আনন্দের সাথে দেখছিলাম তখন প্রয়াত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্ণেল এ. কে. এম. সিকান্দার হোসেন ঐ হলে কালো গ্লাস চোখে নিবিড়ভাবে দাঁড়িয়ে গণনা কার্যক্রম ও পরীক্ষণ কার্যক্রম অবলোকন করছিলেন। চাকুরীজীবনের সেই অতীত আনন্দের হারানো দিনটি মনে পড়লে আজও কেমন জানি আনমনা হয়ে যাই। মরহুম এ. কে. এম. সিকান্দার হোসেন স্যারকে আল্লাহ যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

১৯৮৯ সনে উৎপাদনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেকার সম্পর্ক মধুর ছিল না। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে দুটি শাখার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি পরস্পর বিরোধী লেখালেখিও চলতো। আমি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তা হিসেবে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য তখনকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখার কন্ট্রোল অফিসার জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় স্টার হিসেবে দায়িত্বরত) কে সাথে নিয়ে উক্ত ২টি শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ উৎপাদন এলাকা ও প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকের পরিবারসহ প্রায় ৫০০ লোক নিয়ে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে বনভোজনে যাই। সেই বনভোজনটি ছিল আমার তখনকার আসা চাকুরী জীবনের কৌশলগত সুসম্পর্ক বজায় রাখারই একটি স্মৃতিমূলক উদাহরণ, যা আজও আমার হৃদয়ে দোলা দেয়।

আমিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা তখনকার সময় ভোজনরসিক হিসেবে খ্যাত ছিলাম। এখানে যোগদান করেই বর্তমানে নিচের ক্যান্টিনে ১৯৮৯ সনের জুলাই মাসে নতুন উৎপাদন উপলক্ষে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আমাদের কয়েকজনের খাওয়া দেখে অনেকেই তখন কানা-ঘুষা ও ফিস-ফিস করছিল। ভোজন রসিকদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ে তারা হলেন জনাব আবদুল হাকিম, জনাব গোলাম মাওলা, জনাব হারুন আকবর, ডাঃ নূর মোহাম্মদ আলী আজম ও জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ। তখন অফিসারদের অতিকালীন সময়ে অবস্থানের বিপরীতে শুধু ক্যান্টিনে খাওয়ানো হত। একদিন অতিকালীন সময়ে ৪ জনের রান্না হয়েছিল। জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ একাই ৪ জনের খাবার সাবার করে দিলেন। আজ অত্র করপোরেশনে আমার চাকুরীর শেষপ্রান্তে এসে কল্যাণমূলক কয়েকটি সাফল্যের কথা না বলে পারছি না -

আল কোরআনের সুরা ইয়াসীনের ৫১ নং আয়াতে বলা আছে যে, "যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তৎক্ষণাৎ তাহারা (আদম সন্তান) কবরসমূহ হইতে উঠিয়া নিজ রবের দিকে ছুটিয়া চলিবে।" সুরা ইয়াসীনের ৫২ নং আয়াতে বলা আছে যে, "এবং তাহারা বলিবে (কবরবাসী) হায় আমাদের দূরদৃষ্ট! আমাদিগকে আমাদের কবর হইতে কে উঠাইল? ফেরেশতারা বলিবেন, ইহা তাহাই, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রসুলগণ সত্য বলিতেন"। পূর্বে আমাদের কেহ মৃত্যুবরণ করলে গাজীপুর সদর কবরস্থানে অথবা অন্য কোন স্থানে অথবা সুদূর গ্রামের বাড়িতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও লাশ পাঠানো হতো। এখন নিজেদের স্থায়ী কবরস্থান হওয়াতে একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

বর্তমানে করপোরেশনের প্রায় ৫০ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী আবাসন প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিয়ে বাড়ি/ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। আবাসন সুবিধা ও করবরস্থান তৈরি এই দুইটি কাজের জন্য করপোরেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমৃত্যু বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদকে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করবে।

করপোরেশনের প্রেস ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় যেখানে একসময় ছিল জঙ্গল, ঘাস লতাপাতা ও বিভিন্ন আগাছায় আচ্ছাদিত যা ছিলো শিয়াল ও নানান সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের আবাসস্থল এখন সেই জায়গাটি হয়েছে আনন্দ বিনোদনের একটি মনোরম স্থান। করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আত্মীয় স্বজনরা ও পরিবারের সদস্যরা ছুটির দিনে কিংবা অবসর সময়ে সুযোগ পেলে 'জলকণা'তে এসে ঘুওে বেড়ায়। অতীতের এই জঙ্গল এখন শান বাঁধানো ঘাটসহ খননকৃত পুকুর ও পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে নির্মিত উন্মুক্ত মঞ্চ এবং পুকুরের চতুর্দিকে তৈরি করা ছাতাগুলো সত্যিই বিনোদনকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'জলকণা'কে ঘিরে এখন করপোরেশনের বার্ষিক বনভোজনসহ অন্যান্য প্রীতিভোজ ও নানান অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। আনন্দ বিনোদনের জন্য 'জলকণা'র আমেজটি সৃষ্টির অন্যতম হলেন জিয়াউদ্দীন আহমেদ, আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক। উল্লেখ্য যে, পুকুরটির 'জলকণা' নামটি আমারই দেয়া।

পরিশেষে সুশৃঙ্খল পরিবেশে জাতীয় অনন্য নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী কওে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সকলের দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ্যতা কামনা করে শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ।

--- ০ ---

স্মৃতির পাতায়

দেলোয়ারা বেগম
উপমহাব্যবস্থাপক

১৯৮৮ সাল, প্রয়োজনের তাগিদেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্বামী ব্যাংকার হওয়াতে বিভিন্ন ব্যাংকেই আমার আগ্রহ ছিল। এমন সময় পেয়ে যাই টাকশালের জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি। বিজ্ঞপ্তিটি বিশাল, বিভিন্ন পদে প্রচুর লোক নেবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিষ্ঠান এ বিবেচনায় তখন আবেদন করি। আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল বিসিএস স্টাইলে, ০৩ টি ধাপে; প্রাথমিক নির্বাচন, লিখিত পরীক্ষা ও চুড়ান্ত ভাইবা। প্রাথমিক নির্বাচনের পরীক্ষা দিতে এসেই করপোরেশনের প্রেমে পড়ে যাই। কি সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশ ! সবুজে ঘেরা, শহর থেকে দূরে নির্জন ও শান্ত আবহ।

মন শুধু বার বার বলছিলো, এমন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারলে জীবনটা ধন্য হয়ে যেতো। তখনও জানিনা চাকুরীটা হবে কিনা, সবে তো প্রাথমিক নির্বাচন-দিল্লী বহুদূর । তারপরও আমি আল্লাহর কাছে কায়মন বাক্যে চেয়েছি; আমার চাকুরীটা যেন এই প্রতিষ্ঠানেই হয়। আমি বিশ্বাস করি কোন কিছু অন্তর থেকে চাইলে এবং চেষ্টা থাকলে সে চাওয়া পূরণ হবেই। যেমনটি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। দীর্ঘ সময় পার করে চাকুরীর আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম তখন পেলাম নিয়োগপত্র। সে কি উচ্ছ্বাস আমার। শাজলী (আমার ছেলে) তখন কয়েক মাসের,স্বামী সন্তান ও ছোট একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে ০৩-০৯-১৯৮৯ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানে আমার আগমন।

প্রশাসনে ছিলেন তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক মোহসীন সাহেব ও করপোরেশনের বর্তমান মহাব্যবস্থাপক মোঃ কালিমুল্লা (তখন তিনি সহকারী ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন)।

আমিও তখন সহকারী ব্যবস্থাপক পদে যোগদান করি। তাদের কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর সহযোগিতা ও উৎসাহ। তাদের সহযোগিতায় সহজেই পেয়ে যাই একটি পারিবারিক কোয়াটার ডি-৮/৬ ।

প্রতিষ্ঠানটি বাহির থেকে যেমন ছিল সবুজ মায়ায় ঘেরা, ভেতরেও ছিল কাজের নিরিবিলি গতিময় পরিবেশ। বিশেষ করে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে খুবই উপযোগী। আমার আগে পরে জয়েন করেছিল একঝাঁক তরুণ প্রাণ কর্মকর্তা,কর্মচারী। যাদের সাথে নিয়ে পথ চলাটা ছিল খুবই সুখের। সময়ের পরিক্রমায় এখন কেহ সিনিয়র ও জুনিয়র কেহ বা বস। তখন আমাদের এম,ডি, ছিলেন কর্ণেল এ. কে. এম. সিকান্দার হোসেন। স্যার অত্র ক্যাম্পাসেই এ টাইপ বাংলোতে সপরিবারে অবস্থান করতেন। আমাদের সকলের নাম জানতেন, স্নেহ করতেন এবং কাছে ডাকতেন। স্যারকেও আমরা খুব শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল, একদিন দেখলাম স্যার সপরিবারে ক্যাম্পাস ছাড়া এবং প্রতিষ্ঠানও বন্ধ। স্যারের জন্য মাঝে মাঝেই বেশ খারাপ লাগতো হয়তো আমার নিয়োগকালীন এম.ডি. ছিলেন তাই। মাঝে অনেক বৎসর চলে গেছে, স্যারের সঙ্গেঁ যে কখনো দেখা হবে ভাবিনি। আমাদের সেই স্বাদ ও পূরণ করেছেন বর্তমান এম.ডি. জিয়াউদ্দীন আহমেদ। সিকান্দার স্যারসহ আমাদের পুরানো অনেক স্যারকেই সেদিন (৩১-১২-২০১১ তারিখে) দেখতে পেলাম। সিকান্দার স্যারকে সেদিন খবুই স্বত:স্ফূর্ত লাগছিলো। স্যারের সংগে সংগে আমাদের মনের ভারও যেন অনেকখানি কমে গেল । না হলে হয়তো আর সুযোগও পাওয়া যেতো না-কারণ তার কয়েক মাস পরই গত ২২/১০/২০১২ তারিখের দিবাগত রাতে স্যার ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজেউন)।

জিয়াউদ্দীন স্যারের উদ্যোগেই এবং সমর্থনেই অনেকদিনের পুরানো ক্ষতে প্রলেপ বুলানো সম্ভব হয়েছিল। স্যারকে সে জন্য জানাই ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অফিস এবং উৎপাদন চলছে তার নিজস্ব গতিতে, উত্তরোত্তর উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে লাভের অংকও। মাঝে ঝিমিয়ে পড়া আবাসিক এলাকা আবার যেন প্রাণ ফিরে পেলো জিয়াউদ্দীন স্যারের মাঝে মাঝে সপরিবারে ঈদ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির পাশাপাশি এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ভিষণ চিন্তা করেন এবং উদ্যোগ নিয়ে তার বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা নিয়ে থাকেন এই স্যারের উদ্যোগেই আজ আমাদের শত শত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিজস্ব জমি, বাড়ি এবং ফ্ল্যাট হয়েছে।

সেই যে এক ঝাক তরুণ তরুণী চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলাম, তারা সকলেই এখন সময়ের পরিক্রমায় প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া। কিন্ত মনে হয় যেন সে দিনের কথা মাঝে কয়েকটা বৎসর অতিবাহিত হয়েছে মাত্র। কিন্ত সেই কয়েকটি বৎসর যে ২৪/২৫ বৎসর তা ভাবতেই অবাক লাগে। জীবনের সুন্দর সময়গুলো খুব দ্রুতই চলে যাচ্ছে । আমাদের সহকর্মীরা অনেকে অন্যত্র ভালো চাকুরী পেয়ে চলে গেছেন এদের মধ্যে মেজর (অবঃ) সৈয়দ মাশকুর হোসেন স্যার ইজাহারুল হক স্যার, মাহমুদ আক্তার, মাহবুব এলাহী, ফেরদৌস, কামরুল হাসান সহ অনেকেই। তাদের জন্য তেমন আফসোস নেই, কিন্ত যখন পিছন ফিরে দেখি কামাল স্যার, বদরউদ্দিন স্যার, মাহফুজুর রহমান, আরজু, ভাইয়া শফিক, টিপুসহ অনেকেই চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তখন হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এক সময় অত্র প্রতিষ্ঠানে দাপিয়ে বেড়ানো খান আব্দুস সোবহান স্যার, মজিবুর রহমান আকন্দ স্যার, খন্দকার নূর আলম স্যার অবসরে গিয়েছেন । এটাই চিরাচরিত নিয়ম, একদিন সবাইকে যেতে হবে-একদিন আমিও চলে যাবো। কিন্ত এ প্রতিষ্ঠান রয়ে যাবে যুগ যুগ। প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় আজ এ পর্যন্তই।

--- o ---

টাকশাল ঃ সেকাল আর একাল

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির
উপ মহাব্যবস্থাপক

ইসলামে মুদ্রা ও মিসকাল

ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন কল্যাণকর রীতি ও কৌশল ইসলামে গ্রহণযোগ্য। সিরিয়া ও প্রাচীন পারস্যের সাথে হিজাযের প্রধান শহরের [মক্কা, মদীনা ও তাইফ] অধিবাসীদের বর্হিবাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসেবে মক্কার কুরাইশ বংশ সুপরিচিত ছিল এবং তাদের এই পরিচিতির পিছনে শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক সফর অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুরআনে প্রাক-ইসলাম যুগে কুরাইশ সম্প্রদায়ের এভাবে জীবিকা অর্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে। [সূরা কুরাইশ; ১০৬ ঃ আয়াত ১-৪।] ব্যবসায়ের সূত্রে তারা বাইজেন্টাইন শাসিত সিরিয়া-ফিলিস্তিন হতে বাইজেন্তীয় স্বর্ণমুদ্রা এবং সাসানীয় শাসিত ইরাক ও পারস্য হতে সাসানীয় রৌপ্যমুদ্রা দেশে আমদানী করতো। এগুলো অভ্যন্তরীন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। স্বর্ণমুদ্রা দীনার এবং রৌপ্যমুদ্রা দিরহাম নামে তাদের নিকট পরিচিত ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেই আরববাসী দীনার ও দিরহাম মুদ্রার সাথে পরিচিত ছিল। কুরআন মজীদে ইহুদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যার নিকট অর্থ ভাণ্ডার আমানত রাখলেও সে তা তলব মাত্র ফেরত দিবে। অপরপক্ষে তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যার নিকট এক **দীনার** আমানত রেখে তা আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।" [সূরা আলে ইমরান; ০৩ ঃ আয়াত ৭৫।] আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'অতি সামান্য বা নামমাত্র দিরহামের বিনিময়ে তারা তাঁকে [হযরত ইউসুফ আ.] ক্রয় করেছিল।' [সূরা ইউসুফ; ১২ ঃ আয়াত ২০।] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'দীনার ও দিরহামের সঞ্চয়ের অত্যধিক লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। [আব্বাস, তারীখ আল-নুকূদ আল-ইরাকীয়া [বাগদাদ, ১৯৫৮] পৃ.-৬।] এ দৃষ্টান্তগুলো প্রমাণ করছে, ইসলামের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকে আরবের লোক দিরহাম ও দীনার নামের সাথে পরিচিত ছিল। অন্যথায় এ দুনামের উদ্ধৃতি কুরআন ও হাদীসে দেয়া হতো না। আরবে প্রচলিত মিসকাল পরিমাপের ভিত্তিতে তাঁরা উভয় প্রকারের মুদ্রার ধাতবক মূল্যমাণ নির্ণয় করে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতো। কারণ বিভিন্ন আকৃতি ও পরিমাপের দিরহাম প্রচলিত থাকার জন্য তারা তার মুদ্রাগত মূল্যায়ন না করে মিসকাল ওজনের দ্বারা ধাতব মূল্যমান ঠিক করে ব্যবহার করেছে। দীনারের পরিমাপ নির্ধারিত থাকলেও বিভিন্ন হাত বদলের ফলে পরিমাপ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কায় তারা মিসকাল ওজনের ভিত্তিতে তাকে যাচাই করে নিতো। [আল বালাযুরী , ফুতুহ আল -বুলদান [কায়রো, হিজরী ১৩১৮], পৃ.-৪৭১; আল দীনার আল ইসলামী, পৃ-১০।] এক দীনারের পরিমাপ সাধারণভাবে এক মিসকাল ছিল। [প্রাগুক্ত, আল বালাযুরী , পৃ. ৪৭১।] সাসানীয় দশ দিরহারমের ওজন জাহিলিয়া যুগে আরবদের নিকট বাইজেন্তনীয় সাত দীনার সমপরিমাণের ছিল। [প্রাগুক্ত।] একটি দিরহাম ১৪ কিরাত সমপরিমাণ ওজনের ছিল। [প্রাগুক্ত] দশটি দিরহামের ওজন ছিল ১৪০ কিরাত যা সাতটি দীনারের সমপরিমাণ ছিল অর্থাৎ প্রতিটি দীনার ২০ কিরাত সমপরিমাপের ছিল। প্রাক ইসলাম যুগের আরবগণ দিরহাম ও দীনারের প্রকৃত আকৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে তাদের প্রচলিত পরিমাপের ভিত্তিতে সেগুলো জরিপ করে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। মহানবী সা. এগুলো বহাল রেখেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফাগণ মুদ্রা সংস্কারের দিকে নজর দেন। প্রাক ইসলাম যুগে আরববাসীগণ স্বর্ণ মুদ্রাকে 'আয়ন্থ শব্দ দ্বারা এবং রৌপ্য মুদ্রাকে 'ওয়ারক্ব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হতো। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, " তোমাদের একজনকে ওয়ারাক বা রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে শহরে প্রেরণ কর যেন সে উত্তম খাদ্য ক্রয় করে আনতে পারে। " [সূরা কাহাফ; ১৮ ঃ আয়াত ১৯।] প্রাক ইসলাম যুগের এসব প্রচলিত নামকে ইসলাম-উত্তর যুগে মহানবী বহাল রেখেছেন। তবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুদ্রা মুদ্রণের জন্য টাকশাল প্রতিষ্ঠিত না হলেও প্রতিকৃতি ও প্রতীক চিহ্ন সংশোধন করণের ব্যাপারে দক্ষ কর্মচারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়োজিত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুদ্রার ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। [প্রাগুক্ত, আল বালাযুরী , পৃ. ৪৭২।]

মুদ্রার রকমফের, 'টাকা'-র উৎপত্তি [ড. মোহাম্মদ নিজামুদ্দীন, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।]

রাজ্যের শাসক কর্তৃক জারীকৃত ও প্রতীক চিহ্ন আঁকা নির্দিষ্ট ওজন আর নির্ধারিত ধাতব খন্ডের নাম মুদ্রা। বাংলাদেশ সহ ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রার নাম "ছাপাঙ্কিত মুদ্রা"। রূপা বা তামার পাতের উপর নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে এই সব মুদ্রা উৎকীণ। মৌর্যদের শাসনামলের বহু "ছাপাঙ্কিত মুদ্রা" পুন্ড্রনগরে [বর্তমান বগুড়ার মহাস্থান গড়ে] পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্তদের শাসনাধীন সময়ে মুদ্রার আকৃতি ও সৌষ্ঠবের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় । "ছাপাঙ্কিত মুদ্রার" পরিবর্তে তারা প্রাচীন গান্ধারার

কুষান রাজাদের অনুকরণে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। তাদের অধিকাংশ মুদ্রা ছিল স্বর্ণের,স্বল্প সংখ্যক রৌপ্য ও তাম্রের। স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হত 'দিনার ' বা সুবর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রাকে রূপক। এই সব মুদ্রার মুখ্য পিঠে বিভিন্ন ভংগিতে রাজার প্রতিকৃতি এবং গৌন পিঠে দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী লিপিতে রাজার নাম ও উপাধি লেখা থাকত। গুপ্তদের অসংখ্য শ্রেণীর মুদ্রার মধ্যে চন্দ্র গুপ্ত, কুমারদেবী, ধনুর্ধর,অশ্বমেধ এবং সিংহবধ দৃশ্যধারী মুদ্রা খুবই প্রসিদ্ধ। গুপ্ত পরবর্তী আমলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সব রাজ্যের রাজারা গুপ্ত অনুকরণেই মুদ্রা উৎকীর্ণ করার প্রয়াস পান। কুমিল্লার লালমাই পাহাড় অঞ্চল পূর্বে ময়নামতি নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রা 'ময়নামতি মুদ্রা' নামে পরিচিত। ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ এই সব মুদ্রার এক পিঠে বিশেষ ভঙ্গিতে রাজার এবং অপর পিঠে দেবীর প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই সব মুদ্রায় সোনার পরিমান খুবই কম।

সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল প্রাচীন হরিকেল অঞ্চল। হরিকেল মূদ্রা মূলতঃ রূপার তৈরী। এর এক পিঠে ষাঁড় (নন্দী) অপর পিঠে পদ্মাকারে ত্রিরত্নের একটি প্রতীক দেখা যায়। শশাংক নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজা উত্তর বঙ্গ তথা গৌড়ে রাজত্ব করতেন ৬০৬ থেকে ৬০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুতে তার মূদ্রা পাওয়া যায়। এইসব মূদ্রার একপিঠে রাজার প্রতিকৃতি অন্য পিঠে নন্দীর উপর শিব উপবিষ্ট। পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে (৮ম -১২শ শতাব্দী) ধাতব মুদ্রার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মোহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড় বিজয় করে সেখানে পুনরায় মুদ্রার প্রচলন করেন। মুসলমান শাসনামলে প্রচলিত এসব মুদ্রায় জীব -জন্তুর প্রতিকৃতির পরিবর্তে প্রধানতঃ আরবী ও ফার্সি ভাষায় সুলতানের নাম, তারিখ ও ***টাকশালের নাম*** উল্লেখ থাকত। সুলতান মাহমুদ রৌপ্য দিরহামের সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলেন টংকা। ইলতুৎমিশ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার নাম দিয়েছিলেন 'তানকাহ', কালক্রমে সেই তানকাহ থেকেই বাংলায় 'টাকা' নামের উৎপত্তি হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে। প্রথমদিকে কোম্পানীর লোকেরা স্থানীয় মুঘল মুদ্রা দ্বারা ব্যবসা করতেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ফ্যাক্টরী স্থাপন করে তাঁরা ভারতে প্রথম নিজস্ব মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা থেকেও অনুরূপভাবে মুদ্রা জারী করেন। এগুলো ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে মুঘল মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রচারের ক্ষমতা প্রদান করেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা মুঘল সম্রাটদের নামে মুদ্রা প্রচার করতে থাকেন। বাংলার মুর্শিদাবাদ এবং কলিকাতা টাকশাল থেকে মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলমের নামে উৎকীর্ণ বৃটিশদের অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ সময়ে উৎকীর্ণ তামার সর্বনিম্ন ইউনিট মুদ্রার গায়ে বাংলায় অতিরিক্তভাবে "এক পাই সিক্কা" লেখা হত।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরা গোটা ভারতবর্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন নিয়ে স্বনামে মুদ্রা জারী শুরু করে। এসময়ে জারীকৃত মহারানী ভিক্টোরিয়ার অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। ওসব মুদ্রা থেকে ফার্সী ভাষাকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে ইংরেজী ভাষার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে দু এক জায়গায় বাংলা ভাষার ব্যবহারও দেখা যায়। ১৯৪০ সালের পূর্বে জারীকৃত বৃটিশ মুদ্রা ছিল খাঁটি রূপার। কিন্তু পরবর্তীতে তাম্র নিকেলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রা ছিল তামার তৈরী। মুসলিম আমলে বর্জিত প্রতিকৃতির আবার প্রচলন শুরু হয়। রাজা বা রানীর আবক্ষ প্রতিকৃতি বা "মুখোমুখি দু সিংহ কর্তৃক ধৃত পতাকা" এর প্রতীক দেখা যায়।

কাগজের নোটের প্রচলন

সাধারণত মূল্যবান ধাতু দিয়ে ধাতব মুদ্রা তৈরী হতো বিধায় তা একদিকে যেমন ছিল ওজনে ভারী; অন্যদিকে তা নিয়ে চলাফেরা করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া ধাতুতে ভেজাল দিয়ে নকল মুদ্রা চালুর মাধ্যমে বা মুদ্রার ধার কেটে ধাতু সরিয়ে নিলে মুদ্রার মান কমার প্রেক্ষিত বিবেচনায় কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার বিকল্প হিসেবে বাস্তবতার নিরিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ধাতব মুদ্রার নানা সমস্যা মানুষকে যখন বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করলো তখন স্বর্ণকারদের কাছে মানুষ সোনা গচ্ছিত রেখে স্বর্ণকারদের কাছ থেকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র নিত। প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখা থাকতো,"মালিককে চাওয়া মাত্র ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।" এ সব প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি ছিল। কেউ কাউকে ঐ নিদির্ষ্ট পরিমাণ সোনার বদলে প্রতিজ্ঞাপত্রটি দিলে তা আস্থার সাথে গৃহীত হতো। দিনে দিনে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। কাগজে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্রের জনপ্রিয়তাই পরবর্তীতে কাগজী মুদ্রা চালুর ভিত্তি তৈরী করেছে। সোং রাজবংশের আমলে [৯৬০ খ্রিঃ - ১১২২ খ্রিঃ] চীন দেশে কাগজী মুদ্রা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাগদাদের মুসলিম শাসকরা চীনে উদ্ভাবিত কাগজী মুদ্রার প্রচলন ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন। ইউরোপে কাগজী মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল আরও পরে।

[খন্দকার মাহ্‌মুদুল হাসান, মুদ্রা ঃ ইতিহাস ও সংগ্রহ, জাগৃতি প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। পৃ.-৩৯।]

মুসলিম শাসনামলে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক, স্বর্ণের দিনারের তাম্রে "টোকেন কারেন্সী" প্রচলনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের অসহযোগিতার ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই দুরদর্শী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের দ্বারা সফল হয়। উচ্চতর মূল্যমানের ক্ষেত্রেই এই "কাগজের নোট" প্রচার করা হয়।

পাকিস্তান আমলে এদেশে ধাতব মুদ্রা এবং উচ্চ মূল্যমানের ক্ষেত্রে 'কাগজের নোট' বা বৃটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী "কারেন্সী নোটের"-ও প্রচলন বলবৎ ছিল। একটাকা থেকে নিম্নে আটআনা, চারআনা, দুইআনা, একআনা, দুইপয়সা এবং এক পয়সার মুদ্রা রূপা, নিকেল, তামা ইত্যাদি ধাতুতে তৈরী হত। উচ্চতর মুল্যমানের কারেন্সী নোট ছিল একটাকা, এবং প্রমিজরী ব্যংক নোট ছিল পাঁচ টাকা, দশ টাকা, একশ টাকা। পরবর্তীতে পঞ্চাশ টাকা ও পাঁচশত টাকার কাগজের নোটও জারী করা হয়। মুদ্রা ও কাগজের নোটে নির্দিষ্ট মুল্যমান কথা ও অংকে ইংরেজি, উর্দু ও বাংলায় লেখা হয়। টাকাকে ইংরেজিতে রূপি ও উর্দুতে "রূপিয়া " লেখা হয়।

ভিন্ন মূল্যমানের মুদ্রাগুলি সনাক্তকরণের জন্য প্রত্যেকটিকে দেয়া হয় স্বতন্ত্র আকৃতি। অনুরূপভাবে উচ্চতর মূল্যমানের কাগজের নোটে প্রদান করা হয় ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও আকার। পাকিস্তানী আমলের প্রথম পর্যায়ে কোন কোন নোটে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আবক্ষ ছবি ছাপা হয়। পরবর্তীতে শাসকের প্রতিকৃতি ছাপানোর নিয়ম বর্জন করা হয়।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশ পাকিস্তানী শাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মুদ্রা ব্যবস্থা বৃটিশ ও পাকিস্তানী পদ্ধতি অনুকরনে চালু রাখা হয়। নিম্ন মূল্যমানের মুদ্রার ভেতর ছিল একটাকা, পঞ্চাশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা এবং এক পয়সা। বর্তমানে এক টাকা, পাঁচ টাকার মুদ্রা ছাড়া অন্য এলুমিনিয়াম, তাম্র ও নিকেলের মুদ্রাগুলির প্রচলন আর নেই। তবে এক টাকা ও পাঁচ টাকার কাগজের নোটও বাজারে প্রচলিত আছে। উচ্চতর মূল্যমানের নোটগুলি আগের মত মূল্যমানেই আছে। শুধু ১৯৮৯ সন থেকে দু'টাকার কারেন্সী নোটের প্রচলন শুরু হয়। সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য এদের ডিজাইন ও আকার ভিন্ন ভিন্ন করা হয়েছে তবে ১ ও ২ টাকার কারেন্সী নোটের আকার একই।

বাংলাদেশের জন্য জারীকৃত প্রথম দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ প্রতিকৃতি ছাপা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে নোটের মুখ্য পিঠে মানুষের প্রতিকৃতি দেয়ার প্রচলন সম্পূর্ণ রহিত করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে প্রসিদ্ধ মসজিদের ছবিগুলি প্রাধান্য পায়। পরে অন্যান্য প্রসিদ্ধ অট্টালিকা এবং বর্তমানে শহীদ মিনার , জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় সংসদভবন প্রাধান্য ছিল। গৌন পিঠে শস্য, জাতীয় পাখি , মানুষের জীবনযাত্রা ইত্যাদির দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি প্রাধান্য ছিল। তৎকালীন সময়ে এক টাকার কারেন্সী নোটের মুখ্য পিঠে রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও অপর পিঠে তিনটি চিত্রল হরিণের প্রতিচ্ছবি ছিল। ২ টাকার মূল্যমানের কারেন্সী নোটের মুখ্য পিঠে ছিল ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেরণার উৎস শহীদ মিনার এবং অপর পিঠে ছিল জাতীয় পাখি দোয়েলের ছবি। পাঁচ টাকার নোটের একদিকে স্থাপত্য অলংকরণ হিসেবে পাঠান রাজত্বের শেষ দিকে নির্মিত [২৫৫৮ খৃঃ] কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব, অন্যদিকে নদী তীরবর্তী পাটকলের দৃশ্য। ১০ টাকার নোটে একদিকে ছিল স্থাপত্য নিদর্শন অতিয়া মসজিদের [১৬০৯ খৃঃ] চিত্র অন্যদিকে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধের দৃশ্য। অনুরূপভাবে ২০, ৫০, ১০০ টাকার নোটের মুখ্য পিঠে যথাক্রমে ছোট সোনা মসজিদ [১৬শ শতাব্দী], জাতীয় স্মৃতি সৌধ ও তারা মসজিদ, অন্যদিকে যথাক্রমে নদীতীরবর্তী পাটক্ষেত এবং পাট ধোয়ার দৃশ্য , জাতীয় সংসদ ভবন এবং লালবাগ কেল্লার দৃশ্য। পাঁচশত টাকার একদিকে ছিল তারা মসজিদ এবং অন্যদিকে আধুনিক ইমারত সুপ্রীম কোর্ট ভবনের চিত্র। উল্লেখ্য যে, ১ টাকা থেকে ৫০০ টাকার প্রতিটি নোটে ছিল 'সিকিউরিটি থ্রেড' ও জলছাপে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ। তবে পাঁচ টাকা থেকে উচ্চমূল্যমানের প্রত্যেকটি কাগজী নোটই 'প্রমিজরি নোট' - বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত। শুধুমাত্র ১ ও ২ টাকার নোট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত কারেন্সী।

--- o ---

এ ট্রিবিউটি টু কর্নেল একেএম সিকান্দার হোসেন; যে কথা 'আনোয়ার'কে আজও বলা হয়নি

জহুরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক

এ প্রতিষ্ঠানটির বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। সেই সাথে আমরা যারা মোটামুটি প্রথম থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত আছি তারাও তাদের স্ব-স্ব জীবনের খাতা থেকে কম-বেশি পঁচিশটি বছর হারিয়ে ফেলেছি বা এভাবে বলা যায় আমরা 'এটারন্যাল' একটি জীবনের দিকে আরও পঁচিশটি ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। মানুষের একটি মাত্র জীবনের এই সামান্য একটি সময়কালের ভ্রমণপথে কত স্মৃতি জমা হয়, কত স্মৃতি হারিয়ে যায়। কোন্ স্মৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ, কোন্‌টি নয়, কোন্‌টি বলারমত, কোন্‌টি নয়-তা বিবেচনার জন্য এই পচিঁশ বছরের 'বায়োলিজক্যাল' সময়টুকু যথেষ্ট কি?

সুখময় স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষের জীবনের একটা সময় পেরুনোর পর, বুড়ো হয়ে গেলে, যখন মানুষের দেহের বাধন ঢিলে হয়ে যায়, আত্মীয় পরিজন, আপনজনেরাও দুরে চলে যায়, একাকিত্বের সেই সময়টাতে মানুষ এই মধুময় স্মৃতিগুলোর মাঝে চারণ করে থাকে। সেই সোনামাখানো ফেলে আসা মধুর স্মৃতির ভান্ডার থেকে দু'একটি সোনাদানা তুলে নিয়ে এসে কখনো উত্তরাধিকারদের উপহার দিয়ে থাকে। অবশ্য এই 'উপহার' কখনো উত্তরাধিকারদের চলার পথকে সুগম করতে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু আমরা কি সেই বিশেষ সময়ের প্রান্তে চলে এসেছি? বোধ হয় 'না', বোধ হয় 'হ্যাঁ'। দুটোই সত্য হতে পারে, আবার কোনটিই নয়।

স্মৃতিকথা লেখা যেমন সহজ তেমনি কঠিন। সহজ একারণে যে, স্মৃতিকথায় সাধারণত: লেখকের স্মৃতি-নির্ভর কিছু ঘটণার ক্রমানুযায়ী বর্ণনা থাকে। এর জন্য তেমন কোন সাহিত্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। আবার লেখার 'হাত ভালো' গোছের কিছুরও দরকার নেই। লেখকের স্মৃতির প্রখরতা এবং ঘটনার আকর্ষণীয়তার উপর নির্ভর করে, লেখা কতটুকু উপভোগ্য হবে। আর কঠিন এই কারণে যে স্মৃতিকথা যেহেতু চলতি ঘটণার কিছু সহজ-সরল বর্ণনা, সেহেতু ঘটনার প্রয়োজনে অনেক সময় বিভিন্ন চলমান চরিত্রের উপস্থিতি থাকে, থাকে তাদেরকে নিয়ে ভাবনার প্রকাশ। ফলে কেহ খুশি হতে পারেন আবার কেহ নাখোশ হতে পারেন। অনেক সময় সত্য বলা হলেও মনে হবে কাউকে বোধ হয় 'হেয়' করা হচ্ছে বা কাউকে বোধ হয় 'তোষামোদ' করা হচ্ছে। যা অনেক সময় পাঠকের মনে বিরক্তির কারণও হতে পারে। 'সত্য' কথাটি সহজে গ্রহণ করা যায় না, যায় নি কোনকালেই, এখনো না। তবে নির্ভেজাল স্মৃতিকথা বোধকরি 'মৃত' মানুষকে নিয়ে লিখা যায়। কেননা মৃতব্যক্তি, পৃথিবীর সকল লোভ-লালসা, রাগ-বিরাগ, ন্যায্যতা-অন্যায্যতা,-সবকিছুর উর্ধ্বে চলে যায়।

১৯৮৯ সালে নভেম্বর মাসে বয়ে যাওয়া মৃদুমন্ত হীমেল হাওয়ার কোন একদিনে এই প্রতিষ্ঠানটিতে 'প্রবেশনারী অফিসার' হিসেবে নিয়োগ পেয়ে প্রশাসন বিভাগে কাজ শুরু করি। অফিসার 'হ্যারাক্রি'র সর্বনিম্ন ধাপের একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত কর্নেল একেএম সিকান্দার হোসেন। সেনাবাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা। তার সততা, ন্যায়- নিষ্ঠতা, দক্ষতা, মেধা, উদারতা, এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা লোকমুখে প্রচলিত। সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস-এ প্রচলিত পদে পদে কঠোর নিয়ম-শৃংখলা, তার উপর একদিকে সেনাবাহিনীর একজন জাঁদরেল কর্মকর্তা,অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম এম মোহসীনুর রহমানের মতো তুখোর, প্রতাপশালীএকজন রাশভারী কর্মকর্তা, এঁদের প্রবল ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজাল ভেদ করে একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তার পক্ষে 'মন্ত্রীপাড়া' (আমরা নবনিযুক্তরা রসিকতা করে এই নামে ডাকতাম) নামে খ্যাত এই 'করিডর'টি অতিক্রম করা ছিল 'দিল্লী দূর অস্ত'। অতএব কথা দূরে থাক, তাঁকে কেবল দু'একদিন দূর থেকে তাঁকে হেঁটে যেতে দেখেছি, এটুকই।

প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডেস্কে কাজ করার ফলে প্রশাসেনর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিতে গোল-গোল হরফে লিখা তাঁর সিদ্ধান্তগুলো অসাধারণ মেধার পরিচয় বহন করেছে। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন ভালো মানুষ। নিজের সবটুকু শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে নির্মাণকাল থেকে সফল উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে তিনি তার পরম হাতের ছোঁয়ায় এবং মরমের দরদ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তিল তিল করে গড়ে তোলেন। প্রতিটি জিনিষ তিনি খুঁটিয়ে খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন ফলে প্রতিষ্ঠানের কোথাও পড়ে থাকা একটা 'পিন'ও তার নখদর্পণে থাকতো বলেও শুনেছি।

দীর্ঘ পচিঁশ বছর একসাথে উঠা-বসা করা সত্বেও আমরা আমাদের সহকর্মীদের সবার নাম আমরা জানি,- এ কথা কেউ বোধ হয় বলতে পারবোনা। এটা কেবল তার পক্ষেই যিনি প্রতিষ্ঠানকে কেবল নিজের কর্মক্ষেত্র বিবেচনা না করে 'পরিবার' হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনিও এ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পরিবার হিসাবেই দেখতেন। তাই এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নাম তার পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব হতো। অনন্য গুণের অধিকারী কিন্তু তিনি নিম্নপদস্থ থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সকলের নাম তিনি স্মরণে রাখতে পারতেন। কথা বলার সময় তিনি সবার নাম ধরে ডাকতেন। এ ছিল তাঁর এক অনন্যগুণ।

এ প্রসেঙ্গ একটি ঘটণার কথা বলছি: আমার যোগদানের প্রয় মাস দুই পরের ঘটনা। একদিন পার্সোনেল শাখার দরজা খুলে বেরুতেই লম্বা 'করিডোরটি'তে তাঁর সাথে অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা হয়ে যায়। যথারীতি সালাম দিই। তিনি সালামের জবাব দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জহুর কেমন আছ?' তাঁর মুখে আমার নাম শুনে আমিতো অবাক। তাঁর সাথে এই প্রথম আমার সরাসরি দেখা বা কথা। এর আগে কখনো্ কেনো মুহর্তের জন্যও তার সাথে দেখা হয় নি, কথা হয়নি। তিনি কী করে আমার নামটি জানলেন,-এটা যত বারই ভেবেছি ততবারই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গিয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি দরদ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে আপন সন্তানের মতো 'নার্সিং' করেছেন। তিনি যে এ প্রতিষ্ঠানটিকে কতখানি ভালবাসতেন তা বুঝা যাবে আর একদিনের এই ঘটনায়।

১৯৯২ সালে এক অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে সপরিবারে তাঁর স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে চলে যেতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তখন বন্ধ রয়েছে। চারিদিকে এক অসহনীয় এবং গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছিলো। প্রশাসন বিভাগের কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় ফাইলে প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধান্ত হলো কেহ একজন ফাইলটি ঢাকা গেলে তিনি সই করে দেবেন। কিন্তু ফাইলটি নিয়ে ঢাকা যাওয়ার মতো স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিলো না। ঢাকা যাওয়ারমতো উপযুক্ত আর কাউকে না পেয়ে অবশেষে সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকেই ফাইলটি নিয়ে ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিসে পাঠানো হলো তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করার জন্য। তখন এই লিয়াজোঁ অফিসটির অবস্থান ছিল সেগুন বাগিচায়, শিল্পকলা একাডেমির আশ-পাশে, কোন একটি বহুতল ভবনের একটি ফ্লোরে। লিয়াজোঁ অফিসে এটা তার সাথে আমার দ্বিতীয় স্বাক্ষাৎ (প্রথম স্বাক্ষাতটি হয়েছিলো অফিসের করডিরে অপ্রত্যাশিতভাবে)। মূলত: একজন 'ক্যারিশম্যাটিক' এমডির মুখোমুখি হওয়া বা তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়া ছিল আমার মতো একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে স্বপ্নের মতো। ফলে মনে মনে একধরণের 'শিহরণ'তো ছিলই। যাহোক আমি লিয়াজোঁ অফিসে অপেক্ষা করছিলাম, কিছুক্ষণ পর তিনি আসলেন, টুক-টাক কথা হলো। এইরকম একটি অবস্থার পরও তিনি নাম ধরে ধরে অনেকের খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। বিষয়টা আমাকে বিস্মিত করেছিল বটে। যাবার সময় আমাকে বললেন, "জহুর, মেশিনগুলো কয়েকদিন থেকে বন্ধ হয়ে আছে। আনোয়ার'কে বলো মেশিনগুলো যেন ভালো করে 'ক্লীন' করে রাখে"। কিন্তু তার এই আদেশটি আমি 'আনোয়ার'কে পৌছাতে পারি নি, কেননা তার সাথে বোধ হয় পরবর্তীকালে একই কারণে দীর্ঘদিন দেখা হয় নি। গত .. তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি শুনে আমার কেন যেন সর্বপ্রথম তাঁর এই বাক্যটি মনে পড়ছিল। এত কথা থাকতে কেন কেবল এই কথাটিই মনে পড়ল? বোধ হয় এজন্যই যে, তাঁর 'দরদে'র এই কথাটি কখনই কাউকে বলা হয় নি, জানাতে পারিনি। আনোয়ারকে তো নয় ই।

--- o ---

নানান রঙের দিনগুলি

(নেত্রকোণা টু গাজীপুর)

জামাল উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপক
সাবেক মহা-সচিব, অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন

কবিগুরু রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না; রইল না সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি'। ১৯৮৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে কর্মের প্রয়োজনে আসি। দেখতে দেখতে ২৫টি বছর এর মাঝে এই ক্যাম্পাসে হারিয়ে গেলো। অনেক ভালো লাগা, না লাগার স্মৃতি এখানকারই সঞ্চিতি। ভালো না লাগার স্মৃতি থাকলেও না পাওয়ার বেদনা আমার নেই। যৌবন পেরিয়ে এখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে, স্বভাব সুলভ অভ্যাসগত কারণে এখনও চেষ্টা করি রঙ্গীন চশমায় এই পৃথিবীটা দেখতে; কিন্তু তা কি হয়? যে আগ্রহ নিয়ে টাকশালের চাকুরী নিয়েছিলাম, সেই আগ্রহ নানা প্রতিকূলতায় চাকুরী শুরুর ১৫ দিনের মধ্যে ভাটা পড়ে। আমি কিছুটা আবেগ প্রবণ, আবেগের তাড়নায় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, চাকুরী ছেড়ে দেব। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মকর্তা বিশিষ্ট সুরকার, গীতিকার ও কবি মরহুম আরজু আজহার ও নিরাপত্তা বিভাগের মির্জা গোলাম কিবরিয়া পথ আগলে ধরে আমাকে চাকুরী ছাড়তে দেয়নি, তারা আমাকে অনেক বুঝিয়ে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করেছিলো। এই দু'জনের সেদিনকার ভূমিকায় আমি এখনও এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছি এবং এই স্মরণিকায় লিখতে পারছি, পাশাপাশি এই চাকুরীর কল্যাণেই গাজীপুরে চার ফ্লাটের মালিকানা পেতে যাচ্ছি। শুরুটা যেমনই হউক, বলতে দ্বিধা নেই, ১৯৯২ সালে এই ক্যাম্পাসে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে সরাসরি ভোটে অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতায় আমি মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানে অফিসারদের স্বীকৃত 'ফোরাম' বলতে এটাই প্রথম এবং এটাই শেষ। মনে পড়ে, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিকের আরো অনেক অনেক স্মৃতিকথা, প্রতিষ্ঠান, নিজ এবং চাকুরীর যৌবনকালের নানান রঙের বর্ণিল দিনগুলির কথা, ইন্ডিয়ান বাবু অনিরুদ্ধ ঘোষ (যিনি প্রজেক্টের কাজে দীর্ঘদিন ছিলেন) ছুটির দিনে সকাল ৮ টার মধ্যে আবাসিক ভবনগুলোর সামনে এসে ডাক-হাঁক শুরু করতো, 'এই খসরু তোরা কোথায়? জামিল, জামাল জোয়ারদার কোথায়, টুলু কোথায় এতো ঘুমাস কেন ? সেলিমকে দেখছি না-মাহফুজ সাহেবতো বড় সাহেব, তাড়াতাড়ি মাঠে চলে আয়, খেলা (ক্রিকেট) শুরু হয়ে গেলে তোদের কাউকে আজ খেলায় নেয়া হবে না'। টাকশালে চাকুরী করি, বেতন-বোনাস পাই, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করি। টাকশালের জন্মের সঙ্গে আমার চাকুরীর জন্ম, তাই এই টাকশাল আমার দ্বিতীয় জন্মস্থান। জন্মস্থানের সঙ্গে অন্য জায়গার তুলনা হয় না। জীবনের মায়া-মমতা টাকশালকে উপলক্ষ করে, জীবনে যা প্রাপ্তি তার অধিকাংশ পেয়েছি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। এর বাইরে কি বা পাওয়ার আছে, তাছাড়া কি পাইনি এখান থেকে? দুঃখ-কষ্ট যতটুকু পেয়েছি তার দশগুণ পেয়েছি মানুষের ভালোবাসা। আর এই ক্যাম্পাসের বিশুদ্ধ বাতাস ও নিরাপদ আশ্রয়। অতীত স্মৃতির কথা লিখতে গেলে এতোটুকু লেখায় তা শেষ হওয়ার নয়। তবে কিছু কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে বিধায় কিছুতো লিখতেই হবে।

১৯৯৩ সালের কোন এক সময়ের কথা, ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ী নেত্রকোণায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই ক্যাম্পাস হতে সকাল সকাল রওনা হই। আমাদের বহনকারী গাড়ীটি মাওনা চৌরাস্তায় পৌঁছার আগ মূহুর্তে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। বাড়ী যাওয়া হলো না, এক বুক ব্যথা নিয়ে আহত অবস্থায় স্ত্রী কন্যা নিয়ে ক্যাম্পাসের ফ্ল্যাটে ফিরে আসি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, সেদিন আমার পাশে যারা এসেছিলো এবং চিকিৎসাসহ যারা অন্যান্য সহায়তা-সহানুভূতি দিয়ে সাহস যুগিয়েছিল তা আজো ভুলতে পারিনি। আমার ধারণা, ঐদিন টাকশালে যত লোক ছিল সবাই আমাকে দেখতে এসেছিলো। বলার অবকাশ রাখে না, তিনদিন আমার বাসায় কোন রান্না বান্না করতে দেয়নি আমার শুভাকাঙ্খীরা। মরহুম ফরিদ উদ্দিন, প্রতিবেশী তথা আশে পাশের ভাবীদের সাহায্য সহযোগিতা অধিকন্তু তাদের সহমর্মিতা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। জনাব খান মতিউর রহমান (মাস্টার টেকনিশিয়ান) তার স্ত্রীর রক্তক্ষরণের কারণে মুমূর্ষ অবস্থায় ডাক্তারের নিকট না গিয়ে আমার নিকট গাড়ীর জন্য ছুটে আসে। আমি আমার কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা না করে ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে মানবিক বিবেচনায় তাৎক্ষণিক গাড়ী দিলাম, সে রোগী নিয়ে গাজীপুর জেনারেল হাসপাতালে যায়। সেখানে যথাসময়ে রোগীর শরীরে রক্ত না দেয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রোগী মারা যায়। রাত্রে খবর পেয়ে আমি খুব কষ্ট পেলাম। অথচ এই ক্যাম্পাসে আমার উদ্যোগে ব্লাড ডোনার ফোরাম নামে একটি সংগঠন এর মাধ্যমে শতাধিক রোগীকে রক্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করতে পারলেও এই রোগীর ক্ষেত্রে আমি কিছুই করতে পারিনি। যথাসময় জানতে পারলে হয়তো খান মতিউর এর স্ত্রীর জন্যও রক্তের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। না জানার জন্য একটি প্রাণ ঝরে গেল কি না-এই ভাবনাটি প্রায়ই আমাকে পীড়া দেয়।

আমার ছোট মেয়েটা ৬/৭ বছর পূর্বে হঠাৎ করে লেকের পানিতে পড়ে যায়, তখন তার বয়স ৪-৫ বছর। তাৎক্ষণিক অনেকের মাঝে যাদের তৎপরতায় আল্লাহর রহমতে মেয়েটি বেঁচে যায় তারা হচ্ছেন, এনামুল হক জোয়ারদার, সৈয়দ আমজাদ হোসাইন, কামরুজ্জামান, ও পি-৪ ভবনের অধিবাসীসহ আরো অনেক সহকর্মী। সেদিনও আমার বাসায় টাকশালের সহকর্মীদের ঢল নেমেছিলো, তাদের এই ঋণ কিভাবে শোধ করব? তবে এই দুর্ঘটনার পর কতিপয় কারণে আমি তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও অসহনীয় কষ্ট পেয়েছিলাম যা এখনও আমাকে মাঝে মধ্যে ভাবিয়ে তোলে। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক রোগীর চিকিৎসার জন্য আমি দীর্ঘ ১২ বছর গাড়ী, ডাক্তার ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিয়ে আসলেও আমি সেদিন অনুরূপ কোন সহায়তা পাইনি, কামরুজ্জামানের মোটর সাইকেল এবং এহেতেশামুল করিম সাহেবের প্রাইভেট কারটিই ছিলো আমার একমাত্র ভরসা।

রোমান্টিক স্মৃতিগুলোর মধ্যে প্রেম ও বিয়ের স্মৃতি লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। কারণ সেই সময়ে বিষয়টি আলোচিত ঘটনা। এক ঝাঁক কুমারী রমণীর বেষ্টনীতে উৎপাদন এলাকায় আমিসহ দু'জন অবিবাহিত কর্মকর্তা (জেনারেল সাইডের) যোগদান করেছিলাম। বিপুল সংখ্যক কুমারীর মাঝে চলাচল ছিলো অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপুর্ণ, তবে রোমাঞ্চকর বটে। কিন্তু সে রোমাঞ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা কখনও করিনি বা সুযোগ পাইনি। তাইতো চাকুরীর এক বছরের মধ্যে আমাকে আমার বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছিলো। স্যাটেল ম্যারেজ নয় বলে বাড়ি থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, তাই বলে বিয়ে থেমে থাকেনি।

সংকট মুহূর্তে বিয়ের পিঁড়িতে বসার ক্ষেত্রে যারা আমার চেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রাক্তন জিএম(প্রডাকশন) মরহুম খন্দকার মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব নাজমুল হাসান, জামিল আকতার, জোয়ারদার, খসরুজ্জামান, টুলু, মাসুম ও সেলিম দুররানীসহ আরো অনেক সহকর্মী। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় কাজটা অতি দ্রুত এবং সহজে শেষ করতে পেরেছিলাম। আমার অনেক ঘনিষ্ঠদের (বর্তমানের) ধারণা, সহকর্মী সুন্দরী মেয়েদের মনোযোগ কাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী কমানোর জন্যই নাকি তারা দ্রুত আমার বিয়ের আয়োজন করে। যেভাবেই হোক, এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ের বাদ্য বাজে, ঘরে বউ আসলো; গাজীপুর টু নেত্রকোণা, নেত্রকোণা টু গাজীপুর। এইতো স্মৃতি। টাকশাল ও সহকর্মীদের নিকট হতে সঞ্চিত এর চেয়ে সুখ স্মৃতি আর কি হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে; প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৯ সালে। নাটক হয়েছে নাট্যমঞ্চে, আর নাটকের পরিণতি লাভ করেছে সহকর্মীদের সংসার গড়ার মধ্য দিয়ে। জীবনের প্রথম নাটকের সুবাদে জনাব খসরুজ্জামান, সেলিম দূররানী, মাসুমসহ অনেকে নিজেদের কাজটা (বিয়ের) করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। এ যেন বিয়ের জন্যই নাটক। নাটকের নায়ক-নায়িকা হওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হতো; পরে সবাই বুঝতে পেরেছিলো, এই প্রতিযোগিতা সংসার গড়ার বাসনা থেকেই উদ্ভূত, যদিও আমাকে সাইড নায়কের অভিনয় নিয়ে তখন সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

ভোজন রসিকদের কথাও কিছু বলা দরকার। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে, সমাজের সর্বস্থানে ইমাম সাহেবরা প্রায় প্রতি দিনই দাওয়াত পান। আমাদের ইমাম সাহেবও কয়দিন পর পরই দাওয়াত পেতেন। কিন্ত টাকশালে এসে দেখলাম; আমরা ক'জন প্রতিদিন তার চেয়েও বেশী দাওয়াত পাচ্ছি। মধ্যরাত অবধি সেই দাওয়াত পাওয়ার বা খাওয়ার স্মৃতিগুলো মধুর। নাম লিখা ঠিক হবে না, কিন্তু অনেকে খুবই আয়েস করে খেতেন, যারা হোস্ট তারা তাতে খুব তৃপ্ত হতেন। তবে হিজবুল বাহার খ্যাত সেই মজনুর রহমান (যাদের মনে আছে) তার বাসায় দাওয়াত খাওয়ানোর ঘটনা নিয়ে আমার এবং বর্তমান ডি.জি.এম(ইন্সপেকশন এন্ড সার্ভিল্যান্স) জনাব হাবিবুল্লাহ স্যারের উপর চরম ক্ষেপে গিয়েছিলেন তা সকলে জেনে গিয়েছিলো। এরূপ অসংখ্য স্মৃতি লিখে শেষ করা যাবে না। ঘটনা, দূর্ঘটনা, আনন্দ, বেদনা এই নিয়ে টাকশালে সংসার, যেন একটি যৌথ পরিবার। আমি লেখক বা সাহিত্যিক নই। কিন্তু লেখার আগ্রহ প্রচুর। তাই লেখার মান নিয়ে ভাবছি না, আমার ভাবনাটাকে প্রকাশ করার আকুতি থেকে এতটুকু লিখেই শেষ করছি। কিন্তু আবেগ বা ভাবনার প্রকাশও সহজ নয়। মনের ভাবনাটুকু সুন্দরভাবে, সহজভাবে প্রকাশ করা সহজ নয় বলেই কবি বলেছেন,

'সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে'

এটা খুবই মুশকিল, কোন কথা বলি, আর কোন কথা ফেলি। শেষ কথা হচ্ছে টাকশাল আমার গর্ব ও অহংকার; এখান থেকেই আমার রিজিক সংগ্রহ করি-এই কৃতজ্ঞতাবোধ আজীবন লালন করার বাসনা রইল।

--- o ---

একটি চিঠি এবং কিছু কথা

আবুল আহসান বিশ্বাস
সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা

১৯৯৪ সালের ঘটনা। আমি তখন ঢাকার বাংলামটরে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। যোগদানের ২-৩ মাসের মধ্যে সম্ভবত ১০ জুলাই ১৯৯৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর এক বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আমার চোখে পড়ে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যথারীতি ১২ জুলাই ১৯৯৪ তারিখে আবেদন করি। পূর্ব থেকেই টাকশালে চাকুরী করার মনবাসনা ছিল। আমি যখন গ্রাফিক আর্টসের ছাত্র তখন শিক্ষকদের মুখে টাকশালের গল্প শুনতাম ; যেমন- কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ব্যবহার, ৩/৪ স্তর বিশিষ্ট চেক পোস্ট, কঠোর নিরাপত্তায় মুদ্রণ, সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরা, আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির ব্যবহার, কাজে ঢুকার পর কারো সাথে দেখা করার সুযোগ না থাকা, ইত্যাদি। যাই হোক আবেদন করার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে ইন্টারভিউ কার্ড পেলাম। যথারীতি ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখ ইন্টারভিউ-এ অংশগ্রহণ করলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন জনাব খান আব্দুস সোবহান এবং আরো ৩ জন সদস্য; তাঁরা হলেন মরহুম খন্দকার মোস্তফা কামাল, জনাব মোঃ ইজহারুল হক ও জনাব গোলাম মাওলা। এঁদের মধ্যে খন্দকার মোস্তফা কামাল পরলোকগমনে, জনাব খান আব্দুস সোবহান অবসরে, জনাব মোঃ ইজহারুল হক ও জনাব গোলাম মাওলা বিদেশে। যারা জীবিত তাদের দীর্ঘায়ু এবং যিনি পরলোকে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ইন্টারভিউ বেশ ভালো হয়েছিল। মনে হচ্ছিল চাকুরী হতে পারে। এদিকে ৯-১০ মাস অতিবাহিত হলো বাংলামটরের ঐ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছি। একদিন প্রতিষ্ঠানের মালিকের সাথে বেতন নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। একপর্যায়ে আমি বললাম, 'কাল থেকে আর আসবো না। আজকের মধ্যে আমার সকল দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দিবেন'। সাথে সাথে আমি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলাম।

পরের দিন ৮ মে ১৯৯৫, অফিসে না গিয়ে ঢাকাস্থ মাদারটেক ছোট বোনের বাসায় বেড়াতে যাই। ওখানে আমার বড় বোনও উপস্থিত ছিলেন। সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করলো "আজ অফিসে যাসনি কেন"? আমি বললাম, ছুটি নিয়েছি। আসল ঘটনা বললাম না। দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ছোট ভাই গিয়ে হাজির। আমাকে বলল, ডাক পিয়ন আপনাকে খুঁজছে। খবরটা পেয়ে সাথে সাথে আমি খিলগাঁও পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করি। ডাক পিয়ন আমাকে বলল,' আপনার সু-খবর আছে। আমাকে বকশিস দিতে হবে'। আমি তাকে ২০ টাকা বকশিস দিলাম। সে খুশি হয়ে একটি চিঠি তুলে দিল। চিঠিটি খুলে দেখি জনাব খান আব্দুস সোবহান এর স্বাক্ষর করা নিয়োগপত্র। ৩১ মে ১৯৯৫ তারিখের মধ্যে যোগদান করতে হবে। আমি খুশিতে আত্মহারা, কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। দ্রুত বাসায় গিয়ে সবাইকে আসল ঘটনাটি খুলে বলি। বাংলামটরের ঐ প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ছেড়ে দেয়ার একদিন অতিবাহিত না হতেই 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' এ চাকুরী পেয়েছি। খবরটা শুনে বাসার সবাই আমাকে অভিনন্দিত করতে লাগলো। ঐ দিনটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আমি কখনও ঐ দিনটির কথা ভুলতে পারিনি। দিনটি স্মৃতি হয়ে আছে, স্মৃতি হয়ে থাকবে।

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা সৃজনশীল সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচায়ক। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতে ব্যাকুল, আর এই ব্যাকুলতা থেকে আর্বিভাব ঘটে সৃজনশীল শক্তির, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শিল্প সাহিত্যের, ভরে উঠে সাহিত্যের বিশাল অঙ্গন। প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে করপোরেশনের সহকর্মীদের ব্যাকুলতা এবং সৃজনশীল শক্তির বিকাশ সাধনের প্রয়াসে স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে যথাসময়ে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরেছি বলে প্রকাশনা কমিটির সদস্য হিসাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এ সফলতার জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভর্বিষ্যতে অনুরূপ প্রকাশের আশা ব্যক্ত করছি।

পরিচালক পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের অত্র প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের উৎপাদন কর্মকান্ডকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। এ ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। এ জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অত্র করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ এর সার্বক্ষনিক তদারকি, কর্মতৎপরতা ও একনিষ্ঠ প্রজ্ঞায় আমরা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দারপ্রান্তে। তাঁর মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিচক্ষণতা ও কর্মউদ্দীপনা আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। স্মরনিকা প্রকাশে যারা লেখা এবং

বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের প্রকাশনা কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আগামীতেও তাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী। প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তীর এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে আরো গতিশীল করে তুলবো।

--- o ---

এক টুকরো স্মৃতি

শেগুফতা আনজুম আজিজ

উপ-ব্যবস্থাপক

আশির দশকে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় BAU থেকে মৎস্য বিজ্ঞানে (Fisheries) অনার্স পাশ করে টাকশালে চাকুরী করব কোনদিন ভাবিনি। কারণ তখন দেশপ্রেমে আবেগ তাড়িত হয়ে ভাবতাম, দেশ আমাদের জন্য অর্থাৎ একজন ফিশারিজ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার জন্য কত টাকা ব্যয় করেছে, আর আমি অন্য জায়গায় চাকুরী করে আমার পিছনে ব্যয়িত অর্থ বরবাদ করব,-এটা ঠিক না ; চাকুরী করলে ফিশারিজের চাকুরীই করব; নদীমাতৃক এই দেশে মৎস্য বিষয়ক কাজের অভাব হবে না। অথচ ১৯৮৩ সালে বিয়ের পর ১৯৮৬ সালে বড় মেয়ে কোলে নিয়ে বাকৃবি থেকে পাশ করে বের হয়ে সেই যে পড়াশোনার সাথে আড়ি নিয়েছি আর বইয়ের ধারে কাছেও ভিড়িনি, মাস্টার্স ও করিনি, চাকুরীর চেষ্টাও করিনি।

সংসার, ছোট ছোট দুই বাচ্চা নিয়ে ১৯৮৮ সালে একদিন আবিষ্কার করলাম, বয়স প্রায় শেষের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে, এখন আর যুৎসই চাকুরী খোঁজার সময় নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্ট এর চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেখে আমার হাসবেন্ডকে জানালাম, এখানে আবেদন করব। আমার হাসবেন্ড তখন প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্টের কন্সট্রাকশন কাজের কনসালটেন্টস ফার্ম (BCL) এর এসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। উনি আমাকে এখানে আবেদন করতে নিরুৎসাহিত করলেন। বললেন, এটা ২য় শ্রেণীর অফিসারের চাকুরী, এ চাকুরী করলে হীনমন্যতায় ভুগতে হবে। এখানে যখন ১ম শ্রেণীর চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল তখন আমি একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দুই পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বিছানায় দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। বলাবাহুল্য স্বামীর কথায় কান না দিয়ে এখানেই চাকুরীর জন্য আবেদন করেছিলাম।

আমার ক্লাসমেটদের সাথে যোগাযোগ করে জানলাম ছেলেরা চাকুরীর জন্য উঠে পড়ে লেগে ছিল বলে ছেলেরা মোটামুটি সবাই কোথাও না কোথাও চাকুরীতে ঢুকে পড়েছে। অথচ আমরা কয়েকজন মেয়ে চাকুরীর ধান্দা বাদ দিয়ে স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মনে একটু কষ্ট নিয়ে হলেও এখানেই দরখাস্ত করলাম। চাকুরীর ইন্টারভিউয়ের জন্য তেমন কোন প্রস্তুতি ছিল না তবুও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার বৈতরণীও পার হলাম। অতঃপর ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসের চাকুরীতে জয়েন করলাম। জীবনের প্রথম নতুন চাকুরী ; সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি কে কখন কোন্ ভুল কাজের জন্য বকা দেয়। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর এটাই প্রথম কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হওয়া, তখন মনে হত যেন ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী; ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে মনে হতো Faculty Dean অথবা VC। এটা মনে হওয়ার আরেকটা কারণ হলো Varsity তে পড়াশুনার চেয়ে ব্রক্ষপুত্র নদীর পাড়ে, TSC তে আড্ডা দিয়েই বেশী সময় কেটেছে। 'অফিসার' পদে চাকুরী পেয়ে মনে হতো 'উপব্যবস্থাপক' পদটা না জানি কত বড় একটা পদ; আজ ২০১২ সালে ২৩ বছর পর মনে হচ্ছে চাকরীর শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছি অথচ এখনও সামান্য 'উপব্যবস্থাপক' পদে চাকুরী করছি। কি বিচিত্র মানুষের মন!

প্রথমেই আমাকে প্রশাসনে পোস্টিং দেয়া হয়েছিল। মনে অনেক আনন্দ উচ্ছাস নিয়ে কাজ শিখতে চাইলাম কিন্তু আমাকে দেয়া হলো ছুটি সমন্বয়ের কাজ। যেখানে শেখার তেমন কিছুই নেই। আমি অনুভব করলাম মেয়ে মানুষ বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ রয়েছে, তাই আমাকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ন কাজ দেয়া হয়নি। কোন মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের

দায়িত্ব না দিলে তার দক্ষতা, যোগ্যতা প্রমাণ করার অবকাশ থাকে না। প্রথমে হতাশ হলেও পরে মনে হলো কাউকে না কাউকে তো এ কাজ করতে হবে। যাহোক সৈয়দ এ কে এম মাইদুল ইসলাম স্যার আমাকে চাকুরী চালিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছিলেন; তাঁকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ.কে.এম. সিকান্দার হোসেন স্যার অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ ছিলেন। চাকুরীতে যোগদানের কিছুদিন পরই একদিন জোহরের নামাজের সময়ে অজু করার জন্য মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বাথরুমে গিয়ে সুবিধা করতে না পেরে করিডোর দিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি, পিছন থেকে স্যার আমাকে অবাক করে দিয়ে বল্‌লেন "শেগুফ্‌তা আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের এদিকের বাথরুমে যেতে পারেন"। তখন আমি ভাবতেই পারিনি যে স্যার আমার নাম জানেন। স্যারের কথায় আমি এত চমৎকৃত হয়ে গেলাম, যে আমি কোন কথাই বলতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর মনে হলো আমার তো স্যারকে কিছু বলা উচিৎ ছিল। সেকথা আমার আজও মনে পড়ে। স্যার কিভাবে বুঝলেন আমি বাথরুমের সিরিয়াল পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছি। এরপর স্যার যতদিন এখানে ছিলেন আর কোনদিনই স্যারের সাথে আমার আর কোন কথা হয়নি। ২৩ অক্টোবর ২০১২ তারিখে স্যারের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর স্মৃতিকাতর হয়ে ভাবছিলাম, আমরা সবাই এভাবেই একদিন চলে যাব, কিন্তু আমাকে কি কেউ মনে রাখবে ?

--- o ---

স্মৃতিময় টাকশাল

সোমেন চৌধুরী
সিনিয়র পরীক্ষক গ্রেড-এ

১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে চাকুরী নামক সোনার হরিণের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল রোববার দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বাংলাদেশ লিঃ, গাজীপুর-এ যোগদান করি। তখন আমার কর্মস্থল ছিল ওএসপি ফিনিশিং শাখা। প্রথম দিন সবার সাথে পরিচয় পর্বের মধ্যে শেষ হল। আমি লক্ষ্য করেছি কিছু লোক বিরক্তিকর চোখ নিয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। পরে কারণ হিসেবে জেনেছি অফিস এ পদে মেয়েদেরই 'পরীক্ষক' হিসেবে নিয়োগ দিত। আর আমরাই প্রথমে পুরুষ পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ হয়েছি।

টাকশালে বা এর আশেপাশে আমার কোন আত্মীয় না থাকার কারণে জয়দেবপুরের ছায়াবিথী আবাসিক এলাকায় আমার এক বন্ধুর বোনের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। প্রায় পনের দিন ওখান থেকেই আমি অফিস করেছি। আমার নিকট গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম দেখতে প্রায় একই রকম লেগেছে । তবে গাজীপুর ও চট্টগ্রামের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, চট্টগ্রামে পাহাড় ও সাগর আছে, এখানে তা নেই।

পনের দিন পর টাকশাল কর্তৃপক্ষ আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আবাসিক বাসস্থান পি-৪/৬ নং ফ্লাটের দ্বিতীয় কক্ষটি আমারই এক সহকর্মীর সাথে যৌথভাবে বরাদ্দ প্রদান করেন। বিল্ডিংটির সামনে প্রশস্ত লেক এবং উন্মুক্ত আকাশ আমাকে ভালোই মুগ্ধ করেছে। অফিস শেষে আমার সেই সহকর্মী এবং আমি ছোট দুটি চৌকি কিনে বরাদ্দকৃত রুমে প্রবেশ করলাম। খুবই ছোট রুম, তার উপর আবার দুইজনের দুইটি চৌকি-সে এক মজার অভিজ্ঞতা। সে যাই হোক স্রষ্টার অপার দয়ায় এই ক্ষুদ্র কক্ষেই কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই আমরা আটটি বছর পার করেছি। যদিও আমরা এখনো সেই একই ফ্লাটে বসবাস করছি, তবে তা পৃথক পৃথক কক্ষে। আর আমার পরিচিত জনের কেহ আমার বাসার ঠিকানা জানতে চাইলে আমি অনায়াশে বলেছি আমার ঠিকানা: পি-৪/৬, লেক সার্কাস, তালবাগান। লেক এবং তালগাছের এক অপরূপ সমন্বয় রয়েছে এখানে। এছাড়াও পি-৪ নং বিল্ডিং এর আর এক আকর্ষণ হল শিয়ালের রাজত্ব। প্রথম প্রথম রাতে কারণে অকারণে শেয়ালের হাঁক বেশ ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা বেশ মানিয়ে নিয়েছি।

টাকশালে আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রবিউল ইসলাম। আমরা কাজে যোগদানের প্রথম দিনই তিনি আমাদের সকলকে বোর্ডরুমে ডেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং সেই সাথে কিছু মহামূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন যা আমার জন্য আজও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। তিনি বলেছিলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান আমার আপনার কারোই

ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা রাষ্ট্রের আমানত। আর এই আমানত রক্ষা করা আমাদের নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্ব। এখানে মানুষের সবচেয়ে লোভনীয় বস্তু 'টাকা' উৎপাদন হয়। আপানারা এই টাকাকে টাকা মনে না করে শুধুমাত্র একটি প্রোডাক্ট হিসেবে মনে করবেন, আর তাতেই আপনাদের চাকুরী করা সহজ হয়ে যাবে।' সেদিনকার তাঁর সেই জ্ঞানগর্ব বক্তব্য আজো আমার পাথেয়।

২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমার চোখের সামনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এখানে নতুন বিদ্যালয় ভবন হয়েছে। কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার কথা বিবেচনা করে ই-১৫ এবং ই-১৬ নামে নতুন দুটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়াতদের জন্য একটি কবরস্থান বানানো হয়েছে যা সকলের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল। জলকণার মত একটি নয়নাভিরাম পুকুর ও তৎসংলগ্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চ অত্র প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও একেবারে সামনে একটি চমৎকার গেইট নির্মাণ করা হয়েছে যা করপোরেশনের নিরাপত্তার পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দনও হয়েছে। রাস্তার পাশে নতুন ফুটপাথটি যে-কারো বেশ উপভোগ্য মনে হবে। বিদ্যালয়ের পূর্বপাশে শহীদ মিনারটি অহংকার করার মত।

আমি টাকশালে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ দেখেছি তার সিংহভাগই আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদের হাতে বাস্তবায়ন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নে তাঁর অবদান টাকশালের প্রত্যেকটি কর্মকর্তা এবং কর্মচারী চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। সকলের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর আন্তরিকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে তার সৃজনশীল ভাবনা আমি মনে করি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানকে আরো উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাবে।

টাকশাল বাংলাদেশের কেপিআন্তক্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান তার অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় এ বছর বাংলাদেশ সরকারের সেরা দশ করদাতার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। টাকশালের পঁচিশ বছর পূর্তিতে এটা আমাদের এক বিরাট স্বীকৃতি।

সময়ের আবর্তনে টাকশাল এখন আমার প্রাণ। এখানে সকলের আন্তরিকতা, সহযোগিতা, সততা এবং কর্মস্পৃহা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা নিয়ে টাকশাল আজ তার পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করতে যাচ্ছে যা আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে। আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

--- o ---

দই এর স্বাদ ঘোলে....

আলেয়া খাতুন
সিনিয়র পরীক্ষক গ্রেড-এ

সমরাস্ত্র কারখানায় চাকুরী করতেন আমার এক প্রতিবেশী ভাই। তার ছোট বোন আমার সিনিয়র আপা, বেশীরভাগ সময়ই থাকতেন গাজীপুরে। বাবা মারা যাবার দশ দিন পর তিনি ময়মনসিংহে এসেছেন। একটা বিজ্ঞাপণের কাগজ হাতে দিয়ে তিনি আমাকে বললেন,'সংসারের হালতো তোমাকেই ধরতে হবে। এখানে দরখাস্তকর, পরীক্ষা ভাল হলে চাকুরীটা হয়ে যাবে।'

বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাতেই দেখলাম বেশ কয়েকটি পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আমার জন্য দু'টি উপযোগী পদ রয়েছে। একটি অফিস সহকারী এবং আরেকটি পরীক্ষক। একই বেতন কাঠামো; কোনটাতে করব- ভেবে দেখলাম, সহকারী মানেতো জানি-ই। 'পরীক্ষক' এটাতে করি। আর যাই হোক একটা ভাব আছে প-রী-ক্ষ-ক।

এর আগে বিভিন্ন পল্লীবিদ্যুৎ অফিসে আমি দরখাস্ত করেছি। একটি বিশেষ কারণে আমার জিদ ছিল, নিজের যোগ্যতা দিয়ে একদিনের জন্য হলেও পল্লীবিদ্যুৎ অফিসে আমি চাকুরী করব। সাভার পল্লীবিদ্যুৎ অফিসে পরীক্ষা দিলাম এবং মেধাতালিকায়ও ছিলাম; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আমার চাকুরী হলো না। তাই একটু হতাশ হলাম।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বা এসপিসিবিএল-এ যখন লিখিত পরীক্ষার কার্ড পেলাম তখন '৯৮ সালের ভয়ঙ্কার বন্যা চলছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষা দিতে যাব না। আমার এক মামাতো বোনকে প্রাইভেট পড়াতাম। মামী আমার সিদ্ধান্ত জেনে বললেন,'তুমি অবশ্যই পরীক্ষা দিতে যাবে। ওখানকার পরিবেশটা বেশ সুন্দর। অনেকটা আমাদের ময়মনসিংহের টি,টি,সি এর মত।' বললাম,'পড়াশুনার পাশাপাশি প্রাইভেট পড়িয়ে ভালইতো পাচ্ছি। ভাল পরীক্ষা দিয়েও চাকুরী হয়না। শুধু শুধু টাকা খরচ করে কি লাভ?' মামী বললেন,'তুমি মনে করবে বেড়াতে যাচ্ছ, পরীক্ষা দিয়েই চলে আসবে।'

মামীর পীড়াপীড়িতে শেষে পরীক্ষা দিতে সম্মত হলাম। শিপ্রা আপার এক চাচাতো বোন ও আমি পরীক্ষার আগের দিন সমরাস্ত্র কারখানা এসে থাকলাম। করপোরেশনের সাবেক বিদ্যালয়ের (ডি-১ নং বিল্ডিং) চতুর্থ তলায় আমার সীট পড়লো। পরীক্ষা দেয়ার সময় দেখলাম মহিলা পরীক্ষা কেন্দ্রের একজন মহিলা হল পরিদর্শক এর সাথে কথা বলছেন। লোকজন বলাবলি করছে, যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে তাদেরকে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে; পরীক্ষা নেয়া শুধু নিয়তান্ত্রিক বিষয় মাত্র। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে যা-ই হোক,পরীক্ষা ভাল হয়েছে। কিন্তু তাতে কি? চাকুরীতো আর হবেনা। বাসায় ফিরে সকলকে বলেছি, এত সুন্দর পরিবেশ কিন্তু চাকুরী হবেনা।

কিছুদিন পর লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য চিঠি আসল। ঢাকাস্থ নয়াপল্টনের লিঁয়াজো অফিসে মৌখিক পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা দিতে এসে দেখি সেই মহিলা; ভাবলাম, সম্ভবত তিনিও পরীক্ষা দিতেই এসেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ী কোথায়?' বললাম,'ময়মনসিংহে।' উনি নিজেই বললেন, আমার বাড়ীও ময়মনসিংহ। শুনে মুচকি হাসলাম-কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। উনি বড় বড় স্যারদের সাথে হেসে হেসে কথা বলছেন-আগে থেকেই উনারা পরিচিত, আবার বাড়ীও ময়মনসিংহে! তাহলে কি আমার আর চাকুরী হবে?

সময় তার আপন গতিতে বয়ে যায়। একদিন চিঠি এলো, 'আপনাকে নিয়োগ দানের জন্য প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে....'। গোয়েন্দা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল। তারা চা-নাস্তা কিছুই খায়নি। পুলিশ এসে চা-নাস্তা খেয়ে যাবার সময় তাদের খরচের টাকা চেয়ে বসল। মা পরিচয় দিলেন, 'আপনাদের ডিপার্টমেন্টের লোকের মেয়ে'। কিন্তু তারা বললেন, 'আমাদের রিপোর্ট পাঠানোর পরই মেয়ের চাকুরী হবে।' নতুন করে আশায় বুক বাঁধলাম। পরীক্ষকের চাকুরী। তাও আবার এত সুন্দর পরিবেশে! শুনেছি তিন/চারটা গেট পার হয়ে কাজে যেতে হয়। কল্পনার রাজ্যে ডুব দিলাম। গেটের সামনে দাঁড়াতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দুই-একটা নোট পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তা আসল, নাকি নকল, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবনা পাখা মেলতে থাকল।

আমি সব সময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কোন মানুষ যদি তার অন্তর থেকে ন্যায্য কোন কিছু আল্লহতা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করেন তবে তা অবশ্যই আল্লাহ্ কবুল করেন। সেই সুবাদেই হয়তো টাকশালের নিয়োগপত্র না পেয়ে কুমিল্লা পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের নিয়োগপত্র পাই। জীবনের প্রথম চাকুরী, তাও আবার নিজের যোগ্যতাতেই। নিয়োগপত্র পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললাম। আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জানালাম।

কুমিল্লায় যোগদান করার পনের দিন পর টাকশালের নিয়োগপত্র পেলাম। খুশি হলাম যে যোগ্যতার মূল্যায়ন আছে। কিন্তু প্রথম নিয়োগপত্র পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি এখনে সে আনন্দ পাইনি। এখানকার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করতে করতে কুমিল্লায় চাকুরীর সময় সাইত্রিশ দিন পার হল। টাকশালে কাজে যোগ দিয়েই হোঁচট খেলাম। অটো গেটের পরিবর্তে দেহ তল্লাশী করে কাজে আসা। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দু-একটা নোট পরীক্ষার পরিবর্তে নিজের দুই নয়ন দিয়ে লক্ষ লক্ষ নোট পরীক্ষা করা। আর সহকারী ও পরীক্ষকের পার্থক্য রীতিমত আফসোসে পরিণত হল। তাছাড়া পিসি/আইসি/ সহকারী/পরীক্ষক একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছি। আমার অবস্থা যেন দই এর স্বাদ ঘোলে পরিণত হল। আর সেই মহিলা এখানকারই চাকুরীজীবি দেখে মনে মনে হেসেছি।

নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিলাম। ভেবেছি মাষ্টার্স শেষ করে অন্য কোথাও চাকুরীর চেষ্টা করব। এম.এস.সি শেষ করেছি ঠিকই, তবে অন্য কোথাও আর দরখাস্তই করা হয়নি। এখানকার মায়াজালে আঁটকে গেছি। কাজ করতে করতে সময় কোন দিক্ দিয়ে চলে যায় তা টের-ই পাই না। শুধু প্রিন্টিং হলে গিয়ে একা কাজ করতে করতে মেশিনের শব্দে যখন অবসাদ এসে ভর করে তখন দুই কানের উপর দুই হাত আলতো করে ধরে - একবার হালকা করে খুলে ও আর একবার বন্ধ করে টিনের চালের ঝমঝম ঝড় বৃষ্টির মত শব্দ শুনে শুনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্য জগতে চলে যাই।

--- o ---

ভুলিনি তোমায়

মোঃ আব্দুর রউফ
ব্যবস্থাপক

প্রায় দুই দশক আগের কথা। ১৯৯২ সালের মার্চ মাস। করপোরেশনের বর্তমান মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সেদিন ছিল না। সবুজ শ্যামলিমায় ভরা প্রতিষ্ঠানের এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ছিলনা, তেমনি ছিলনা অফিসের সুষ্ঠু-সুন্দর কর্ম পরিবেশ। তৎকালীন সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের কারণে অফিসের পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত ও থমথমে। একেতো নতুন কর্মস্থল, তদুপরি এহেন বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তা বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে নানা দ্বিধা ও সংশয় বিরাজ করছিল। কিন্তু নিরাপত্তা বিভাগে যোগদানের পর সব সংশয় দূর হয়ে যায়। কারণ সহকর্মী হিসেবে যাদেরকে পেলাম সবাই ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও কো-অপারেটিভ এবং সর্বোপরি প্রায় অধিকাংশেরই ছিল ডিফেন্স ব্যাক গ্রাউন্ড। যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রথম যেদিন অফিসে এলাম সেদিন রিসিপশনে নিরাপত্তা সহকারী পাশেই,দেখলাম দাঁড়ানো মাঝ বয়সী দাড়ি-টুপিওয়ালা এক ভদ্রলোককে (তৎকালীন সহকারী নিয়ন্ত্রক (নিরাপত্তা) মরহুম বদর উদ্দিন আহমেদ) দেখিয়ে বললেন, "স্যার, ইনি আপনার লোক"। আমি সালাম জানালে তিনি সহাস্যে হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন। সিজিএস-এ গিয়ে দেখি ডিউটি অফিসারের চেয়ারে বসা নিরাপত্তা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু সাঈদ এবং পাশের চেয়ারে বসে আছেন অপর নিরাপত্তা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম। আর বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পেলাম তৎকালীন উপ-নিয়ন্ত্রক জনাব মেজর (অবঃ) সৈয়দ মাশকুর হোসেন স্যারকে। তাঁদের সম্পর্কে কম-বেশী সবাই জ্ঞাত। এখন যার কথা বলা ও স্মৃতিচারণের জন্য আজকের এ উপস্থাপনা তিনি ছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন সহকর্মী, সুহৃদ ও শ্রদ্ধাভাজন গুরুজন সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা মরহুম শফিকুর রহমান (সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার)।

অত্র প্রতিষ্ঠানে আমরা দু'জন একইসাথে সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করি। সহকর্মী হলেও বয়সে আমার অনেক বড় হওয়ায় তিনি ছিলেন আমার পিতৃসম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক চরিত্রের একজন উদার মনের মানুষ। প্রায় এক বছর যাবৎ আমরা একই ফ্লাটের পাশাপাশি দু'টি কক্ষে বসবাস করেছি। চাকুরির শুরুতেই তার মতো একজন বন্ধুসুলভ, পিতৃতুল্য মানুষকে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে নতুন কর্মস্থলের নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সেদিন আমার কোন অসুবিধাই হয়নি। তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ প্রদান ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তার সাথে মাত্র কয়েক বছরের চাকুরী জীবনে কত যে স্মৃতি তা বলে শেষ করা যাবে না। ডি-১ এ অবস্থানকালে একই বুয়া আমাদের দু'জনের রান্না করে দিত এবং একত্রেই খেতাম। খাওয়ার সময় প্রায়ই তার দাঁতে পাথর কণা পড়তো এবং 'উ-হু' শব্দ করে তিনি কি যে একটা বিরক্তিকর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন তাতে আমি আর আমার হাসি চেপে রাখতে পারতাম না। আমি মজা করে বলতাম, "শফিক সাহেব, আপনার সাথে পাথরের বোধ হয় বন্ধুত্ব আছে? যত পাথর শুধু আপনার দাঁতেই আটকায়, আমার দাঁতে একটাও পড়ে না।" ঢাকার নিজ বাসা থেকে ভাবী পিঠাসহ মজাদার বিশেষ খাবার রান্না করে পাঠালে তিনি আমাকে ছাড়া একদিনও তা খেতেন না। তিনি সর্বদা নিজের হাতে চা তৈরি করতেন এবং প্রতিবারই আমাকেও এক কাপ অফার করতেন।

আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে একমাত্র তিনিই বরযাত্রী হিসেবে পাবনা গিয়েছিলেন। বিয়েতে কনে পক্ষ থেকে গেটের মধ্যে লাল ফিতা বেঁধে যথারীতি বরযাত্রীদেরকে আটকানো হয় এবং রেওয়াজ অনুযায়ী টেবিলের উপর গ্লাসে নানা ধরনের শরবত পরিবেশিত হয়। কাকতালীয়ভাবে শফিক সাহেব যে শরবতের গ্লাসটি নিয়ে পান করেন তা ছিল অত্যন্ত লবণাক্ত (ইচ্ছাকৃতভাবে বর পক্ষকে ঠকানো বা জব্দ করার জন্য)। সেই লবণাক্ত শরবত পান করে তার মুখের যে বিকৃতি তাতে উপস্থিত সবাই তো হেসে লুটোপুটি।

আমার মাস্টার ডিগ্রী অর্জনের পিছনে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি কক্ষে অবস্থানের কারণে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলাম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ পর্ব পরীক্ষা দিবেন। ভাবলাম তিনি যদি এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সে পড়াশুনা করতে পারেন তাহলে আমি যুবক বয়সের একজন লোক হয়ে কেন পারব না। মূলতঃ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এমএসএস করি।

সবচেয়ে ট্রাজিক যে ঘটনাটি আমার মনকে আজও ব্যথিত ও আলোড়িত করে তা হলো হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার আকস্মিক মৃত্যু। ১৯৯৫ সালে যেদিন তিনি মারা যান সেদিন আমি এনএসআই স্কুলে সিকিউরিটি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকায় অবস্থান করছিলাম।

সেসময় মোবাইলের তেমন কোন প্রচলন না থাকায় আমার প্রিয় সহকর্মীর মৃত্যু সংবাদটিও আমি তাৎক্ষণিকভাবে পাইনি। আরো দুঃখজনক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা হলো- তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়, কিন্তু আমি ঢাকায় অবস্থান করেও তার জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হতে পারিনি এবং শেষ বারের মতো এক নজর দেখতেও পারলাম না।

১৯৯৫ সালের পর অত্র প্রতিষ্ঠানে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগদান করেছেন তারা কেউই তাকে জানেন না, কেউ হয়েতো অন্যের মুখে তার কথা শুনে থাকতে পারেন। পুরাতন সহকর্মীদের অনেকের মন থেকেই তার কথা ও স্মৃতি হয়তো মুছে গেছে। আমি কিন্তু কখনোই তার কথা ভুলতে পারিনি। সর্বদা তার জন্য দোয়ায় মাগফেরাত কামনা করি। প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী লগ্নে তাঁর কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে। আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন (আমীন)।

--- o ---

৪০ জনের সাথে আমি

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
জুনিয়র টেকনিশিয়ান

স্মৃতির পাতায় মোড়ানো এক চিলতে রোদ্র, এক খন্ড কালমেঘ। কল্পনা শক্তির প্রকোপ থাকার কারনে স্বপ্নের আবির্ভাব আর এই স্বপ্নের পূর্ণতা হতে পারে স্মৃতিময়। দুঃখকর স্মৃতি আমাদের জীবন দশায় হঠাৎ ঘূর্নিঝড় হারিকেনের রূপ ধারন করে এসে তছনছ করে দেয় আমাদের জীবন চলার গতিপথ। আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের নবাগত একজন কর্মচারী। আমার ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানে স্মৃতিপটের কিঞ্চিৎ অংশ ধারণ করে আছে। আমরা ৪০ জন সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে বাৎসরিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হই।

একে একে দুই বৎসর গত হয়ে গেছে। তিন বৎসরে পদার্পণ করলাম। আমাদের স্থায়ী হওয়ার কোন আশা ছিল না। অতঃপর আমরা মাননীয় এম.ডি মহোদয় ও অত্র আসনের মাননীয় সাংসদ মহোদয়ের শরনাপন্ন হলাম। অতঃপর স্বহৃদয়বান এম.ডি মহোদয় ও ৪৯তম পর্ষদ আমাদের আকুতি শুনলেন। আমাদের স্থায়ীকরণ করা হলো। এমডি মহোদয়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ৪০ পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া করি আল্লাহ উনাকে দীর্ঘজীবি করুক। সেই সাথে জোরালো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর চেয়ে আর বড় কোন সুখময় স্মৃতি ঘটেনি এস.পি.সি.বি.এল-এ চাকুরীরত অবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনে।

দুঃখের স্মৃতি ভোলার মত নয়। আমি চাকুরীতে যোগদানের পর থেকে কর্মরত অবস্থায় আমাদের ছেড়ে এ পৃথিবী হতে না ফেরার দেশে চলে গেলেন আমাদেরই সহকর্মী মোঃ মনোয়ার হোসেন (নিরাপত্তা প্রহরী), মোঃ আজহার আলী (নিরাপত্তা প্রহরী), আলাউদ্দিন শেখ (সার্ভিস বয়), মোঃ আজহারুল ইসলাম আরজু (নিরাপত্তা কর্মকর্তা), মোঃ বদরউদ্দিন আহমেদ (ডিজিএম), মোঃ ইউসুফ আলী সরকার (সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা), মোঃ গুলজার হোসেন (নিরাপত্তা প্রহরী) ও মোঃ আলমগীর হোসেন (নিরাপত্তা প্রহরী)। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আর মরহুমদের স্বজনদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।

এই সব স্মৃতি নিয়ে আমরা অত্র প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী পালনা করবো। জাকজমকপূর্ণ উৎসব হোক এস.পি.সি.বি.এল এর ২৫ বৎসর পূর্তি (রজত জয়ন্তী)। নবাগত কর্মচারী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমার অত্র প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে স্মৃতি চারণ।

--- o ---

কিছু স্মৃতি কিছু ধৃতি

ম. তওফিকুর রহমান
ব্যবস্থাপক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে শেরে বাংলা নগরস্থ সামরিক নিরীক্ষা বিভাগের জ্যৈষ্ঠ অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) অফিসে চা খেতে খেতে কি যেন জরুরী কাজে সবেমাত্র মন দিয়েছি। পেছন দিক থেকে জুনিয়র ফ্রেন্ড শহীদ এসে আমার চেয়ারটা ঝাঁকুনী দিয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে প্রস্তাব করলো, আমি যেন অন্যদের সাথে সিকিউরিটি প্রিন্টিংয়ের চাকরীর জন্য আবেদন করি। টাকশাল নামের বদলে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস বলায় ভাল করে না বুঝেই বললাম, ঢাকার বাইরে চাকরী করবো না, এখানেই ভাল আছি। ও আমাকে আড়াল করে এক ধাপ বেশী ভালবাসে জানতাম, সেই কথার রেশ ধরে বললো, চাকরী না করেন, অন্ততঃ ইন্টারভিউর উছিলায় আমার বাসায় এক বেলা খাবেন, অন্ততঃ সে জন্য চাকরীর আবেদনটা করুন। আমার গিন্নী ওখানেই জব করে, আমাদের বাসাও ওখানেই। তাতে রাজী না হওয়ায় সে নিজেই মান্ধাতার আমলের ঠক্ ঠক্ করা টাইপ মেশিনে কাগজ পুরে দিয়ে চাকরীর আবেদনের কিছু অংশ আমার জন্য টাইপ করে বললো, পিতার নামসহ বাকী তথ্যগুলো আর শিক্ষার প্রমাণক কাগজগুলো দিন, আমি নিজেই আবেদন রেডী করে নিচ্ছি। বন্ধুর পীড়াপীড়িতেই শেষতক বেড়ানোর নাম করে চাকরীর আবেদন রেডী করলেও নিজের তেমন কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ***"নিয়তি যেখানে টানে, লোক ছুটে সেই পানে"*** বলে আমিও শেষ অবধি টাকশালে অফিসার পদে চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে একদিন সকালে বরিশালের শহীদ, রংপুরের এরশাদ ও পাবনার সালাউদ্দিনসহ কয়েকজন সহকর্মী কাম বন্ধু মিলে বিআরটিসি বাসে চেপে ঢাকা থেকে শিমুলতলী এসে পৌঁছাই। প্রথম দিকে কিছুটা উদাস উদাস মনে আর নুতন স্থান দেখার কৌতুহল নিয়ে এগোতে এগোতে টাকশালের থার্ড গেটে এসে পৌঁছাই। তখন ফোর্থ গেট বলে কিছু ছিল না। গেটের সামনে পরীক্ষার্থীদের উপচে পড়া ভীড়ের মধ্যে একসময় আমরা হারিয়ে যাই। উপস্থিতির বিস্তর সংখ্যা আমাকে প্রথমে হতাশ করলেও মনে মনে লোভ সঞ্চারিত হতে লাগলো এই ভেবে, এমন পরিপাটি, সুরম্য, আবাসিক ফ্যাসিলিটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যদি চাকরীটা মহান আল্লাহ পাক যুগিয়েই দেন, তবে জীবনের মানেই হয়তো বদলে যাবে। বিস্তর আলাপের মাথায় এসে জানলাম, এটিই সেই বহুল আলোচিত টাকশাল, যেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের টাকা ছাপানো হবে। নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল, কিভাবে-কখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা সম্ভব হবে। তারপর থার্ড গেট পেরিয়ে যখন অফিসের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছলাম, তখন এর বাড়তি সৌন্দর্য্য দেখে আমি বিস্মিত, বিমুঢ়।

ঐ দিনই নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে স্ক্রীন টেস্ট হিসাবে আমাদের গ্রুপ-ভিত্তিক ইন্টারভিউ নিলেন প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) মেজর অব. সৈয়দ মাশকুর হোসেন, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী জনাব নাজমুল হাসান ও প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আবদুল বারী সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড। বোর্ডে অপরাপর সদস্যদের তুলনায় আমার জবাব অধিকতর সন্তোষজনক হওয়ায় আমাকে তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচিত হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন শ্রদ্ধেয় মাশকুর স্যার। সারাদিন এক বুক টেনশন, বুক ভরা আকাঙ্খা, চমৎকার সব দৃশ্য অবলোকন শেষে বন্ধু শহীদের বাসায় ফিরে খেতে বসে এর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলোর কথা জানলাম। বিশেষ করে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার আলাদা বেতন কাঠামো দেবেন, এর বাসাগুলো হবে ফ্রি–ফার্নিশড্ ও রেন্টমুক্ত, এখানে সিকিউরিটি এলাউন্স থাকবে, আবাসিক এলাকার বাসাগুলো এয়ারকন্ডিশনড্ হবে ইত্যাদি আরো কতকি। শুনছি আর লুকনো ভয়ে চুপসে যাচ্ছি, যদি এত দামী চাকরীটা না হয়, যদি হাত ফসকে যায়। ও আলাপান্তে আমাকে বললো, আপনার চাকুরী এখানে হবেই আমি নিশ্চিত। এখন দেখে নিন, কোন বাসায় থাকবেন, কাকে বিয়ে করবেন ইত্যাদি আরো কত কি। বন্ধুর বাসার নিমন্ত্রন শেষে আবার ঢাকায় নিজ কর্মস্থলে ফিরে গেলাম, গোপনে টাকশাল নিয়ে কিছু স্বপ্ন আমার হৃদয়ে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। অনুভব করলাম, দিনে দিনে এ স্বপ্ন দেখার মাত্রা বেড়ে বেড়ে আমাকে প্রস্তুতির পথে বেশ এগিয়ে দিল। বুঝতে পারছিলাম, চাকরী পেতে আমাকে যে পথ পাড়ি দিতে হবে, তা নিঃসন্দেহে বন্ধুর। তাই সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

মাস তিন চারেক পর আমাদের লিখিত পরীক্ষার ডাক আসলো। পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হলাম প্রেসের নীচ তলায় ব্যাংক নোট শীট পরীক্ষন হলের উত্তর প্রান্তে। পরীক্ষক হিসাবে হল রুমে আমি কাছ থেকে যাকে সতর্ক ভংগীতে টহল দিতে দেখেছি তিনি আমার বর্তমানে অতি প্রিয় মানুষ খশরু ভাই। যাহোক, পরীক্ষার মাস ৩/৪ পর পুনরায় ডাক পড়লো চূড়ান্ত ভাইবার। এ পরীক্ষাটি খোদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কর্ণেল (অব.) এ.কে.এম. সিকান্দার হোসেন স্যার নেবেন শুনে গলা শুকিয়ে গেল। এ বোর্ডে তাঁর সাথে ছিলেন দুইজন সৈয়দ সন্তান সুপ্রিয় সর্বজনাব সৈয়দ এ. কে. মাইদুল ইসলাম (প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক-উৎপাদন) ও সৈয়দ মাশকুর

হোসেন। বোর্ডে এক পর্যায়ে মাশকুর স্যারের সাথে একটি প্রশ্ন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলেও আমার পক্ষে সৈয়দ এ.কে.মাঈদুল ইসলাম অবস্থান নেয়ায় সেবারের মত উত্ড়ে যাই। অবশেষে চাকরীর নিয়োগ পত্র আমাকে সুদূর চট্টগ্রামের এফপিও ইবিআরসির বারান্দা থেকে তুলে এনে এখানে পৌছিয়ে তবেই ছাড়লো। মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে শোকর গুজার করলাম, আজও করি। এখানে চাকরী করতে এসে অনুভব করলাম, সূরা আল কুরাইশ যেন আমাদের জন্য সে আমলের মত এ আমলেও সমভাবে প্রযোজ্য। আরবের কুরাইশদের মত আমাদের শীত-গ্রীষ্মের সফর নিরাপদ রেখেছেন, তিনি এ প্রতিষ্ঠানে চাকরীর মাধ্যমে আমাদের ক্ষুধায় খাদ্য ও ভয় থেকে হেফাযত করেছেন।

কাজে যোগদান করে এক মজার ফ্রেন্ডলী ব্যাচ পেলাম, যাদের নিয়ে ভার্সিটির আড্ডা গাজীপুরে এসেও অনুভব করলাম। করিম খান, জোবায়দুল, শেগুফ্তা, ফেরদাউস, শাখাওয়াত, কামরুল, শাজাহান, ওয়াদুদ, নুরুল, বাবলুসহ আরো কয়েকজন রয়েছে। এরই মধ্যে তৎকালীন ইএমসিএস এর শাখা প্রধান সহকারী ব্যবস্থাপক প্রয়াত মাহফুজুর রহমান স্যার আমাদের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। প্রথম দেখাতেই তিনি আমাকে এক নিমিষে তার দলভুক্ত করে কিভাবে যে প্রনোদণা দিলেন, তার সেদিনের অমলিন হাসি আর মজলিসী গল্পে আমি বিমুগ্ধ। কি ভীষণ আন্তরিক, সদাহাস্যময়, আলাপী মানুষ ছিলেন এই মাহফুজ স্যার। কত অসংখ্য গুনের সমাবেশ ঘটেছিল এ মানুষটির মধ্যে তা যারা দেখেছেন-তাদের ভুলে যাওয়া কঠিন। মনে আছে, একবার সার্ডিতে তাদের বাসায় আড্ডা মারতে গিয়ে যে দৃশ্যের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে-তা আজও মনের কোণে আটকে আছে জীবন্ত ফ্রেমে। ক্রিকেট খেলার মজাকে আরো রসদার করে তোলার জন্য তিনি মাঝে মাঝে টিভি থেকে খেলার স্কোর, প্লেয়ার রেটিং, স্পেশাল নোট ইত্যাদি পেন্সিল দিয়ে কাগজে টুকে নিচ্ছেন, আবার সে মানুষটি টুং টাং করে বাম হাতের আংগুল দিয়ে গীটারে সুর ছড়াচ্ছেন-একই সাথে ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সাথে কখন চানাচুর, কখনো আংগুরের দানা মুখে তুলছেন। মাহফুজ ভাই ছিলেন এক কথায় অল-স্কয়ার। বাতাস মাড়িয়ে, দেহ নাচিয়ে, মিষ্টি সুরে গান গেয়ে গেয়ে তাঁকে হোন্ডায় ছুটে বেড়াতে দেখেছি। তার সে পথ চলায় দুরত্ব কোন ছার। জুনিয়ার-সিনিয়রদের সাথে সমান তালে মিলেমিশে সব প্রোগ্রামাদি সেরে নিতেন। তার হাতের ছোঁয়ায় তুচ্ছ জিনিসও যেন হয়ে উঠত জীবন্ত। তিনি একধারে ভাল লিখতে, গাইতে, আঁকতে, অভিনয় করতে পারতেন। খেলার মাঠেও তার ঝুড়ি মেলা ভার। কি ক্রিকেট, কে ফুটবল, কি ভলিবল, কি ব্যাডমিন্টন কি টেবিল টেনিস-সর্বত্রই তার সমান উপস্থিতি। তার পাশে থেকে এসপিসি সচিবালয়ে কাজ করার স্মৃতি আজও আমার কাছে অমলিন। কিন্তু বিধির অমোঘ বিধানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যান চিরদিনের জন্য। মহান আল্লাহ এ গুনী মানুষটিকে গুনামুক্ত করে জান্নাত দান করুন। সবার কাছেও তার জন্য দোআ চাইছি।

প্রকৌশল বিভাগ কাজ করতে যেয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছি সর্বশ্রদ্ধেয় রমিজ স্যারদ্বয়, আব্দুল হাকিম, মোহাম্মদ আইউব, আবদুল বারী, মঞ্জুর মোর্শেদ, শাজাহান আলী, আব্দুস সাত্তার, আব্দুল আলীমসহ অনেককে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও প্রকৌশলী কাইয়ুম স্যারের সাথে পরিচয়ও ছিল বেশ মজার। জীবনের অনেকগুলো বসন্ত কেটেছে যে সব মানুষের সাথে-সাহচর্যে, তাদের অনেকে ভিন্ন পেশায় যাবার জন্য চাকুরী ছেড়েছেন কিংবা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। টাকশালের প্রায় শৈশবে আমাদের আগমন। তখনকার মাঠগুলো ছিল প্রায় বিরান। আমার তোলা সে সময়কার বেশ কিছু ছবি দেখলে আজ নিজেই তাড়িত হই এই ভেবে, সময় কত দ্রুত বয়ে যায়। দেখতে দেখতে কত অসংখ্য বসের সাথে দেখা হয়েছে-কত জনের সাথে কত মজার স্মৃতি রচিত হয়েছে-তারা আজ কে কোথায়? কত দূর-দূরান্ত ঘুরে বেড়িয়েছি গোলাম মাওলা, মাহবুব-এলাহী, ফেরদাউস, করিম খানকে নিয়ে। আজ আমাদের সকলের মাঝে রচিত হয়েছে সময়গত ফারাক, বিস্তর ব্যবধান। আমাদের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে আমাদের অতি প্রিয় সন্তানরা। আজ আমরা সকলেই বুড়োর কাতারে এসে দাঁড়িয়েছি। তারুণ্যের কাতার থেকে অভিভাবকের চেয়ারে। আমার এক সন্তান এ টাকশাল হতে ২০০৯ সালে বিদায় নিয়েছে। দেখতে দেখতে তাও ৪ বছর ছাড়িয়েছে। তার সাথে টাকশালের বাসা, মসজিদ, অভ্যন্তরীন রাস্তাসহ নানা স্থানে, প্রান্তরে হাজারো স্মৃতি তন্তুহীন মালায় গ্রথিত রয়েছে। তার প্রস্থান টাকশালের সাথে আমার-আমাদের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করে দিয়েছে। তাঁর স্পর্শ নিয়ে টাকশাল ছাড়িয়ে গাজীপুর জেলা আজ আমার আপন হয়ে উঠেছে।

টাকশালের উদ্বোধনকালে আমরা যারা এখানের চাকরীতে ছিলাম, সেই স্মৃতি আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। দেশের সবচেয়ে দামী প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন এত কাছ থেকে দেখার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আনন্দ-এর কোন জুড়ি নেই। দেশী-বিদেশী মেহমান, কূটনীতিকবৃন্দ, সামরিক ও বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের এমন সম্মিলন আর কখনো হবে কিনা কে জানে? দেশের প্রেসিডেন্টের এ উপলক্ষ্যে আগমন এ দীর্ঘ সময়ে একবারই ঘটেছে। টাকশালের টাকার উপর সবার প্রচন্ড নির্ভরতা থাকলেও এখানে আর কারো আসার সময় হয়নি, এটি দুর্ভাগ্য। তবে সব গভর্নর মহোদয়গন এ প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের সীমাহীন ব্যস্ততার মাঝেও নিবিড় ভালোবাসায় সিক্ত রেখেছেন। বিশেষ করে বর্তমান গর্ভনর মহোদয় ড. আতিউর রহমান স্যারের সময় প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটেছে। আজ

কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বিশেষে আমরা মাথা গোজার জন্য গৃহ নির্মানের যে সুযোগ লাভ করেছি, সেটিও এই মহতী মানুষের ভালবাসা থেকে নিঃসৃত। তাকে ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সে জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাই, শ্রদ্ধা জানাই।

সবচেয়ে বেশী সান্নিধ্য পেয়েছি বেশ কয়েকজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের। সচিবালয়ে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের নিবিড় সান্নিধ্য আমাকে নানামাত্রিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করেছে। শ্রদ্ধার সাথে মনে পড়ে সিকান্দার স্যারের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ, মোয়াজ্জেম স্যারের রাশভারী গলার সতর্ক উচ্চারণ ও প্রশাসনিক মেজাজ, তৌফিক স্যারের অনাবিল সরলতা আর কোমলতামাখা প্রশাসন পরিচালনা, রুহুল আমীন স্যারের নির্মোহ সত্যাগ্রহ দায়িত্ব পালন, রবিউল ও জিয়া স্যারের ক্লান্তিহীন পরিবর্তনমুখী নুতন নুতন প্রচেষ্টার কথা। আশরাফ আলী স্যার রসহীন বৈঠকে সর্বদাই রসের সঞ্চার ঘটিয়ে পরিবেশকে ভিন্নরুপ দানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁরই আমলে এসপিসি নেপালের ডাক-টিকেট পরীক্ষামূলকভাবে মুদ্রন করে তার অর্জিত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখেছে। এর বাইরেও যাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অথচ আজ তারা এখানে নেই তাঁরা হলেন, প্রধান প্রকৌশলী মোঃ নাজমুল হাসান, প্রয়াত মহাব্যবস্থাপক কামাল উদ্দিন, প্রয়াত উপ মহাব্যবস্থাপক তোফাজ্জল হোসেন, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক মোঃ আহসানুল কবীর, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ইজহারুল হক, প্রয়াত মোঃ আবুল খায়েরসহ অনেক। ইজহার স্যার, মাহমুদা আপা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান মহাব্যবস্থাপক ইস্কান্দার ভাই, গোলাম মাওলা, মাহবুব এলাহীসহ সবাই মিলে টাকশালের উত্তর দিকে নাতিঘন গজারী বনে সংক্ষিপ্ত পিকনিকে আমোদ-ফুর্তি আর গোল্লাছুটের কথা এখন বেশ জীবন্ত। সে সব বহুমাত্রিক ছেড়ে আসা অমলিন স্মৃতিগুলো আজো মনে করলেই ভীষন আবেগ তাড়িত হই, মনে এক ধরনের ভাবালুতা তৈরী হয়, ফিরে যেতে ইচ্ছে করে দূর অতীতে। এ সব ভাবনা আমাকে অনেক চেষ্টার পরও এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র যেতে দেয় নি। বড় বড় চাকরীগুলোকেও নির্মোহভাবে ছেড়ে আসতে হয়েছে, কি দরদী আকর্ষণে, মোহে।

এসপিসি একটি প্রাণহীন সত্ত্বা। এ প্রান্তরকে কর্মমূখর করার জন্য নিয়োগের মাধ্যমে এখানে তুলে আনা হয় দেশের নানা প্রান্তর থেকে চেনা-অচেনা অনেক মানুষকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তর হতে এখানে রুটি রুজীর জন্য লোকের সমাগম ঘটে বিস্তর। কাজের পরিবেশে এসে এখানে একের সাথে আরেকের সম্পর্ক তৈরী হয়। আমাদের সময় সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক রচিত হয়েছে, যা এখনও চলছে। এর ফলে আমরা সবাই এক বৃহৎ পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছি। আমরা পরস্পর সুখে-দুঃখে জড়ো হই। আনন্দ করি, সমবেদনা জানাই। আমাদের এ ভালবাসা আগামীতে আরো বিকাশ লাভ করলে তবেই এটি সার্থক হয়েছে বলা যাবে। এক কালে সবার নাম না বলতে পারলেও কম-বেশী সবাইকে চিনতাম। অথচ আজ আর তা পারি না। এমন অনেক সহকর্মী বেশ বছর কয়েক থেকে এখানে চাকুরী করছেন, তাদের অনেককে হয়তো কখনো দেখিনি। বিধির বিধান মোতাবেক ইতোমধ্যে অনেক সহকর্মী আমাদের রেখে চলে গেছেন না ফেরার অচেনা গহীন দেশে। আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি, তারা যেন হারানো সাথীদের ভুলে না যাই-এ ভাবনা আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। কেননা আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও একইসাথে ব্যস্ততার কারণে আমরা কিছুটা বেসামাল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমাদের কিছু নিয়ন্ত্রণ দরকার। শুধু আর্থিক সমাগম ঘটানো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না, বরং আমাদের উপর মহান প্রভুর ঈপ্সিত দায়িত্ব পালনেই হল চরম সার্থকতা। সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হল, আমরা কিছু সময় পর আর এখানে থাকবো না। আমাদের সেই চলে যাওয়াটা সব মিলিয়ে যদি সফলতা বয়ে আনে, তবেই আমাদের এই সম্পর্ক জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সেই আকাংখা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই।

করপোরেশনের মাধ্যমে মহাপ্রভু আমাদের যা দিয়েছেন, তাঁর ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারবো না। তাই তাঁর কাছে শোকরিয়া জানানোসহ তাঁর হামদ করি, তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সাহসী ও আন্তরিক শ্রমের মাধ্যমে আরো উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন এবং সেটিকে স্থায়ী করেন। এর কোলে যেন দেশের হাজারো মায়ের সন্তানের রুটি রুজীর ব্যবস্থা হয়, উৎপাদনের রজত জয়ন্তীর এ ক্ষণে শুভ কামনা রইল। সবাইকে ভালবাসা নিরন্তর। আল্লাহ হাফেজ।

--- o ---

স্মরনীয় স্মৃতি

আনোয়ার-উল-হুদা
উপ-ব্যবস্থাপক

এখন থেকে ২৭ বছর আগে ১৯৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর পরিচিতি ছিল। ঐ সময়ে আমাদের ১৮ জনের একটা গ্রুপ ব্যাংকনোট মুদ্রণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলাম।

আমি ছিলাম থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে, আমার বিষয় ছিল নাম্বারিং মুদ্রণ। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফিরে ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক টাকার কারেন্সি নোটে নম্বর মুদ্রণের মাধ্যমে নোট প্রিন্টিং এর সূচনা করেছিলাম।

তারপর ১৯৮৯ সালে আমি চলে আসি ও.এস.পি. বিভাগে। এই বিভাগে তখন অগ্রণী ব্যাংকের দশ পাতার সঞ্চয়ী চেক বই মুদ্রণ শুরুর মাধ্যমে ব্যাংকের কাজ শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে ডাকবিভাগসহ অন্যান্য কাজও আসতে শুরু করে।

এইভাবে কেটে কেটে গেল পঁচিশটি বছর, অনেক ঝড় বয়ে গেল টাকশালের উপর দিয়ে। পরপারে চলে গেলেন নিজের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রয়াত কর্ণেল এ.কে.এম. সিকান্দার হোসেন। আরও অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্থান সংকূলান হবে ন।

--- o ---

আমাদের প্রিয় টাকশাল

অশেষ বিশ্বাস
সিনিয়র পরীক্ষক, গ্রেড- বি

তখন ঢাকা থাকতাম। ছাত্রজীবন সমাপ্তির পথে। পত্রিকায় একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ'। নামটি বেশ পছন্দ হল। পদের নাম-'পরীক্ষক'। আরও পছন্দ হল। এরপর আবেদন, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ইত্যাদি। পরীক্ষা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স ফ্যাকাল্টির একটি বিল্ডিং এ। আর ভাইভা বাংলাদেশ ব্যাংকে। এক সময় নিয়োগ পত্র হাতে পেলাম।

২০০৪ সালের ৮মে চাকুরীতে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে রওয়ানা হই। কিন্তু আবদুল্লাপুর এসে গাড়ী থেমে গেল, আগের দিন জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এম.পি. শহীদ হন। গাজীপুরে প্রতিবাদ কর্মসূচী চলছে। এরপর কখনও হেঁটে, কখন রিক্সায়। আবার পিকেটারদের হামলায় রিক্সা থেকে নেমে দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়েছি। এভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম সিকিউরিটি প্রিন্টিং এর আশপাশেই হবে। কেননা তখন গাজীপুর মানেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতাম। আর গাজীপুর- ১৭০৩ যে শিমুলতলী তা জানা ছিল না।

এ কর্পোরেশন আমার চাকুরী জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র। অফিসের ঝকঝকে পরিবেশ এবং নিয়মশৃঙ্খলা দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। ব্যাংক নোট ফিনিশিং শাখায় আমাকে পোস্টিং দেয়া হল। সেখানে কাড়ি কাড়ি টাকা দেখে আরও অভিভূত হয়েছিলাম। যেন টাকার বাগান। যে বাগানে রয়েছে অসংখ্য টাকার গাছ। আর গাছে নাড়া দিলেই টাকা পড়ে, ঝরা পাতার মত। এতো যেন সেই ছোটবেলা শোনা টাকা ফলা বৃক্ষ, একবারে লক্ষ্মীর ভান্ডার।

সকল প্রকার নোট- দু' টাকা থেকে হাজার
ছাপছে এখানে মনে হয় যেন লক্ষ্মীর ভান্ডার।

চাকুরীতে যোগদানের প্রায় সাথে সাথেই p-4 এর একটি কক্ষ আমাকে বরাদ্দ দেয়া হয়। p-4 করপোরেশনের ঈশান কোণে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করলেও এর বিশেষত্ব রয়েছে। এটি করপোরেশনের প্রথম বিল্ডিং। এখানে অবস্থান করে পরিকল্পনাকারীরা করপোরেশনের গোড়াপত্তন করেন। এর প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ। বাঁকা লেকের পাড়ে এটি অবস্থিত। বিল্ডিং এর সামনেই একটি তালগাছ। তাই আমরা অনেকেই p-4 এর বিকল্প ঠিকানা-তালতলা, লেক সার্কাস বলে অভিহিত করি।

দিনের সিংহভাগ সময় আমাদের অফিসেই অতিবাহিত করতে হয়। প্রায় কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে অফিস যাওয়া, দুপুরে নাকে- মুখে দু'মুঠো অন্ন গ্রহণ এবং প্রায় মধ্য রাতে অফিস থেকে বাসায় ফেরত। এখন এ রুটিন আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। এর মাঝেই আমাদের হৃদয়টাকে সুরভিত রাখে করপোরেশনের আবাসিক ও অফিস এলাকায় সুদৃশ্য বৃক্ষরাজি ও ফুল। সকালে অফিস যাবার পথে কয়েকটি শিউলি, বকুল বা বেলী কুড়িয়ে যখন হাতে নিতাম তখন এর সুগন্ধ আমার সতেজ মনটাকে আরও চাঙ্গা করতো। আবার রাতে ক্লান্ত দেহে যখন অফিস থেকে বের হয়ে বাসায় রওয়ানা হতাম তখন হাসনাহেনা ফুলের সৌরভ আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিত। যেন নতুন করে প্রাণশক্তি ফিরে পেতাম।

যখন কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ায় লাল- হলুদ মঞ্জুরী প্রস্ফুটিত হয় তখন করপোরেশন এলাকায় এক উজ্জ্বল আভা ছড়ায়। পাঁপড়ীগুলো ঝরে পড়ে যেন লাল গালিচা তৈরি করে। ফাগুন মাসে পাতাহীন শাখায় যখন রঙিন পলাশ ফোটে তখন মনটাও রঙিন হয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য ফুলের সমাহার তো আছেই। পাখির কুজন শুনতে হলে অফিসের উত্তর-পশ্চিম কোণার পাম গাছতলায় সন্ধ্যায় আসতে হবে। পাখির কলকাকলী আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমি নিশ্চিত, পাখির এত কলকাকলী আপনি আর কোথাও সহসা শুনতে পাবেন না।

সেগুন বাগিচা, জলকণা বেড়ানোর জন্য চমৎকার জায়গা। জঙ্গল ছিল বলে ও দিকটায় আগে যাওয়া হত না। এখন কোন গেস্ট এলে ওখানে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসে সবাই। কেননা টাকশালে বেড়ানোর মত ওটাই একমাত্র খোলা জায়গা। যেন জঙ্গল সাফ করে সভ্যতার পত্তন। সৃষ্টিশীল মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। ধন্যবাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদকে।

জীবনের যৌবন বেলা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে। বাকি কর্মজীবন হয়তো এখানেই কাটবে। আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ এ করপোরেশনকে ঘিরেই। তাই আমাদের জীবনের গল্প, স্মৃতিকথা আর করপোরেশন যেন একই সুতোয় গাঁথা। শুধু দুই এক পৃষ্ঠা লিখলেই এটা শেষ হবার নয়। যেন গোটা টাকশাল একটা পরিবার। আমরা সে পরিবারের সদস্য। আর সবাই মিলে সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করছি।

একে অপরের সম্পর্ক যেন গভীর আত্মীয়তার
সবাই মিলে আমরা এক 'টাকশাল পরিবার'।
আমাদের ঠিকানা একটাই, জেনে নিন
এসপিসিবিএল, গাজীপুর – ১৭০৩।

--- o ---

সেইসব দিনের অম্লান স্মৃতিচারণ

তাহেরা খানম
সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা

সারা বিশ্বে প্রিয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (চাকুরীক্ষেত্রে) আমার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দি এস.পি.সি.বি.এল. (টাকশাল) গাজীপুর জেলার মনোমুগ্ধকর ও দূষণমুক্ত পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৮২ সালে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিতে এসে এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাটি খুড়াখুড়ি করতে দেখেছিলাম। তখন শুনেছিলাম ওখানে টাকশাল হবে।

চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করলাম-১৯৮৭ সালে এবং নিজ বাড়ি থেকে মাটির রাস্তা দিয়ে প্রায় ৮ মাইল পায়ে হেঁটে মৌখিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য হাজির হই এবং লাইনে দাঁড়াই; কিন্তু যখন আমার ডাক পড়বে ঠিক তখন মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোস্তাফা কামাল। লাঞ্চ এবং নামাজের জন্য বের হয়ে আসেন। তখন আমি স্যারকে বললাম-স্যার আমি সকাল ৭ টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি এবং আমার বাড়িতে পায়ে হেঁটে যেতে হবে, কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। স্যার আমার পরীক্ষা এখন না নিয়ে লাঞ্চের পর নিলে আমার বাড়ি ফিরতে রাত হবে। অনুগ্রহপূর্বক আমার মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার পর লাঞ্চে গেলে আমি খুবই উপকৃত হব। তখন তিনি আমার পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন এবং পরীক্ষা দেয়া পর আমি সময়মত বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম। চাকুরী হওয়ার পরও হেঁটে বাড়ি যাতায়াত করতাম। জনাব মোস্তফা কামাল খুবই ভাল লোক ছিলেন-তাঁর উপকারের কথা আমি ভুলিনি। কখনো ভুলবনা।

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর দূর্বাঘাসের ডগায় হালকা শীতের শিশির বিন্দু পেরিয়ে সকালের হিমেল হাওয়া মাখানো মিষ্টি রোদের পরশে অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদান করেছিলাম। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ছিলেন- মোঃ আজিজুর রহমান বেগ। আমি অবশ্য কর্ণেল (অবঃ) এ.কে.এম. সিকান্দার সাহেবকে প্রথম এমডি হিসাবে পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমাদের কর্ণধার। তিনি অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ ছিলেন।

১৯৮৮ সালে ব্যাংকনোট ফিনিশিং হলে ফাইনাল প্রোডাকশনের আগে কাজের আগাম ট্রায়াল হচ্ছিল। তখন আমাদের স্যার ছিলেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম তিনি আমাকে এবং সহকর্মী ইয়াসমিন সুলতানাকে কর্মঠ, শক্তিশালী, বিচক্ষণ স্বাস্থ্যবান দেখে প্রথমে ডিস্টিবিউটর হিসাবে কাজ করতে বলেন। তখন আমি স্যারকে অনুরোধ করে বলি আমি ডিস্টিবিউটর পদে যোগদান করিনি। তখন পাশে দাঁড়ানো ছিলেন এমডি মহোদয়। তিনি বললেন,'আমি দুইদিন দেখব'। উল্লেখ্য সবাই পরীক্ষক ছিলাম, কোন ডিস্টিবিউটর ছিল না। পরবর্তীতে আলোচনা সাপেক্ষ পর্যায়ক্রমে সবাইকে ডিস্টিবিউটরের কাজ করতে হবে বলে মৌখিক সিদ্ধান্ত হল। এমডি স্যারকে আমি চিনতাম না। কিন্তু এমডি স্যার পরবর্তীতে দেড় বছরের মাথায় আমাকে পদোন্নতি দিয়েছিলেন। আমি ৯৪জন পরীক্ষকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।

কর্ণেল (অবঃ) সিকান্দার স্যার থাইল্যান্ড এবং অন্য দেশের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করতেন। আমাদের কার্যকলাপ দেখতেন, ভাল-মন্দ কুশলাদি বিনিময় করতেন, সমস্যার সমাধান করতেন। তিনি ভাল কাজের জন্য বাৎসরিক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর সুকর্মের কথা আমি ভুলিনি, ভুলব না।

পঁচিশ বছরের জীবনের স্মৃতি একটি গ্রন্থেও লিখে শেষ করা যাবে না। নোটে মুদ্রণের ইতিহাসের প্রথম স্মৃতি হচ্ছে। ২৬/১২/১৯৮৭ সালে এসএস এবং ০৮/০৩/১৯৮৮ তারিখে এসআই প্রিন্টের নোট শীট প্রথম মুদ্রিত হয়। ০৭/১২/১৯৮৯ তারিখে হুসেইন মুহাম্মদ

এরশাদ (সাবেক রাষ্ট্রপতি) এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মসজিদ উদ্বোধন করেন জনাব এমডি মোয়াজ্জেম সাহেব। ১৯৮৮ সালে ১০ টাকা এবং ১৯৮৯ সালে ০২ টাকা, ১০০ টাকা এবং ০৫ টাকা, ১৯৯১ সালে, ১৯৯৭ সালে ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা এর মূল্যমানের নোট ২০০৮ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রতিটি টাকা আমাদের কোমল হাতের প্রথম নরম ছোয়া বহন করছে।

চাকুরীতে যোগদানের সময় শুনেছিলাম যে, বিশ্বের অন্য দেশের টাকশালের চাকুরীজীবীদের মত এখানকার চাকুরীজীবীদের বাসা, ফার্নিচার ফ্রি দেয়া হবে, স্বতন্ত্র বেতন স্কেলসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। ঐসব সুবিধা আমরা না পেলেও বর্তমান এমডি জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদের কালে হাউজলোন উৎসাহ বোনাসসহ আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি।

একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গোড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠন ও বিকাশে আমাদের সকল সহকর্মীর নিরলস প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়। বর্তমান এমডি নতুন কিছুর প্রবর্তন করে করপোরেশনের কর্মীদের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। প্রথম বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস-প্রভৃতি জাতীয় দিবসসমূহ আমরা তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে নতুন পরিবেশ ও আনন্দময় আবহে পালন ও উপভোগের প্রেরণা পাচ্ছি। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁর উদ্যোগে আবার চালু হয়েছে। আমরা সকলে এই দিনে করপোরেশনের সাথে সাথে তাঁরও দীর্ঘয়ু কামনা করছি।

আমার জীবনের মূল্যবান সুন্দর দিনগুলো শীটহলের সহকর্মীদের সাথে কর্মব্যস্ততায় কেটে যায়। অতিকালীন কাজসহ দিনের ১৫ ঘন্টাই অফিসের কর্মব্যস্ততায় কাটে। এখানে আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বিভিন্ন উপজাতি সহ সবাই মিলেমিশে কাজ করি। আমার উপশাখায় ৬৪ জনের সাথে একই পরিবারের মত মিলেমিশে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করি।

এ শীট উপশাখায় পরীক্ষকবৃন্দ কর্মঠ ও আন্তরিক । পঁচিশ বছরের কর্মময় জীবনে আমাদের মাঝে সৌহার্দ্য, ভালবাসা ছাড়া কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরবর্তী কর্মজীবন যাতে শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে সবাই সুস্থ্য থেকে কাজ করতে পারে সেজন্য চাই-পরম করুণাময় আল্লাহ ও সবার কাছে দোয়া।

--- o ---

মজা পুকুর থেকে 'জলকণা'

সৈয়দ আহমেদ
ডেপুটি ম্যানেজার

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ নামের এই প্রতিষ্ঠানটি গত ২৩ শে অগ্রাহয়ণ ১৩৯৬ বাংলা (৭ ই ডিসেম্বর ১৯৮৯) তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। তবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তার পূর্বের বছর ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে। করপোরেশনের ২৫ বছর পূর্তিতে স্মরনিকা প্রকাশের আহ্বানে আমার ভাবনায় ৬৬.৫২ একর জমি বিস্তৃত প্রাকৃতিক পরিবেশ ভরপুর এই অন্যন্য প্রতিষ্ঠানটির বিশাল স্থান দখল করে আছে। পাশাপাশি নিজে করপোরেশনের চাকুরীতে সম্পৃক্ত থেকে ২৫ বছর পূর্তি করতে পেরে মহান আলাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনটি টাকশাল নামে সকলের নিকট বেশী পরিচিতি। আগে প্রতিষ্ঠানটির চত্বর যারা ঘুরে দেখেছেন তাদের নিশ্চই মনে পড়বে করপোরেশনের মূল ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পশ্চিম পার্শ্বে ফেন্সিংয়ের বাহিরে একটি ওপেন ড্রেন থাকার কারণে প্রায়ই সময়ে ভরাট হয়ে যেতো। ফলে কর্পোরেশনের ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট পান্টের কেমিক্যাল বর্জ্য যথার্থভাবে নিষ্কাশন না হওয়ায় দক্ষিণ-

পশ্চিম মজা পুকুরের পাড় ভেঙ্গে স্যুয়েরেজ লাইনের সাথে মিশে গিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং পুকুরের চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল আগাছা থাকার কারণে শিয়াল ও সর্পের উপদ্রপ বেড়ে গিয়ে রাস্তা চলাচল অনুপোযোগী হয়ে যায়। ফলে চলাচলে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় চলাচল উপযোগী করার জন্য নিরাপত্তা বিভাগ, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন শাখা এবং বসবাসকারীগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দীন স্যার বিষয়টি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে কর্পোরেশনের পরিচালক পর্ষদের সম্মতিক্রমে প্রশাসন বিভাগকে উক্ত পুকুরের চারিপার্শ্বে অচল রাস্তাকে সচল করার জন্য নির্দেশ দিন। আমাদের সাথে জিয়াউদ্দীন স্যারও উক্ত কাজের তদারকিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় মজে যাওয়া পুকুরটির চারিদিকে সকলের বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের সকাল সন্ধ্যা নিরাপদে পাঁয়ে হাটার একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্বল্পতম সময়ে গড়ে উঠেছে। আমি নিজে প্রচন্ড গরমে ছাতা মাথায় নিয়ে তদারকি করেছে ; এখন পুরকুরটি চারিপার্শ্বে গাছ-পালা সবুজ ঘাশে আবৃত ফুলের বাগান এবং আর্কষণীয় পাকা সিড়িঁঘাটে এলাকাটি মনোরম পরিবেশ সকলের কন কেঁড়েছে। সন্ধ্যায় পাখির কলরব, মাছের লাফা-লাফি, চারিদিকে বাগান, সবুজ ঘাস সব মিলে মনে এতই আনন্দ দেয় যে যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়, বিশেষ করে পূর্ণিমা চাঁদনী রাতে অনেকেই এখানে বসে প্রশান্তি পায় এবং রাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। পুকুরটির নাম কি হবে-এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শেষে সবদিক বিচার বিবেচনা করে পুকুরটির নাম দেয়া হয়েছে 'জলকণা'। উক্ত জলকণা গত ১৭ই শ্রাবণ ১৪১৭ বাংলা (১লা আগষ্ট ২০১০) তারিখে জিয়াউদ্দীন স্যার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়ে আনন্দ মুখর পরিবেশে উদ্ধোধন করেন। জলকণার পাশেই রয়েছে সবুজ গাছ পালায় পরিবেষ্টিত একটি পাকা উম্মুক্ত মঞ্চ। উক্ত মঞ্চে বাংলাদেশের সকল জাতীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসহ এসপিসি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। কাজের অবসরে করপোরেশনের কর্মরত, বসবাসরত কর্মচারী-কর্মকর্তা, তাদের পরিবারের সদস্যগণ এবং আগত মেহমানগন পুকুর পাড়ে বসে তাদের সারাদিনের ক্লান্তি মোচন করেন। আমি এই একটি কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সকলের সাথে বেঁচে থাকতে চাই।

--- o ---

ট্রেড ইউনিয়ন ও আমার অভিজ্ঞতা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
আফিসার

১৯৮৬ সালে ডিগ্রী পাসের পর ১৯৮৭ সালে পুলিশে সাব ইন্সপেক্টরে চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউ দেই এবং এক আত্নীয়ের মাধ্যমে চাকুরী নেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু উৎকোচ দিতে হবে বিধায় বাবার অনিচ্ছার কারণে ওদিকে আর অগ্রসর হইনি। ইতোমধ্যে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে চাকুরীতে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র হাতে পাই। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রোডাকশন চেকার পদে যোগদান করি। প্রতিষ্ঠানটি তখনও একটি প্রকল্প । এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন কর্নেল (অব:) এ কে এম সিকান্দার হোসেন। চাকুরীতে প্রবেশ করে দেখলাম প্রিন্টিং মেশিন এবং কাটিং মেশিনগুলি সংস্থাপন করা হয়ে গেছে । উৎপাদন শুরুর পর্যায়ে চলে এসেছে, স্ট্রংরুমগুলোও তখন ধোয়ামোছার কাজ চলছে। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে আমরাও অংশগ্রহণ করেছি। সদ্য যোগদান করা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সকলেই বয়সে তরুন। বিশেষ করে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৌশলী ও টেকনিক্যাল লাইনের লোক। প্রায় সকলেই তারুন, তাদের উদ্যম ও আগ্রহে শুরু হতে যাচ্ছে উৎপাদন; উৎপাদনের প্রারম্ভে দশ টাকার কালার ম্যাচিং। এখানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই চাকুরী ক্ষেত্রে নতুন তথা চাকুরীর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন আর্মি পার্সন হওয়ায় অত্যন্ত কঠিন প্রশাসন,স্বল্প বেতন, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মকর্তার দুর্ব্যবহার; এসব কারণে কখনো কখনো অসহনীয় মনে হতো। অনেকেই সদ্য কলেজ থেকে এসে যোগদান করায় কারো কারো মধ্যে কিছুটা বিপ্লবীভাব। আস্তে আস্তে এখানে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালুর দিকে, ঝোঁক সৃষ্টি করে। তখন পার্শ্ববর্তী মেসিন ট্যুলসে পুরোদমে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চলছে। ওখানকার কিছু বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি নিজেও কিছুটা প্রভাবিত হই এবং সেলিম মাহমুদ, ফরিদ উদ্দিন, ইউসুফ আলী সরকার, খান মতিউর রহমান, সাফায়েত হোসেন, আবু তাহের মোলা, সিরাজ উদ্দিন, মো: আকতার উজ্জামান, শফিকুল ইসলামসহ আরও কিছু অকুতোভয় কর্মচারী মিলে মেশিন

টুলসের মাঠে বসে ১৯৮৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন এর প্রাথমিক কমিটি গঠন করি। আমি ঐ কমিটির প্রচার সম্পাদক ছিলাম। অত্যন্ত সংগোপনে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য" ডি" ফরম পূরণ করা শুরু করি। সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দেয়ার পর কেহ রাজি না হলে তাকে জোর করে হলেও সদস্য করানো হয়েছে। এ ভাবে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন জমা দেয়া হয়-সেলিম মাহমুদ ও ফরিদ উদ্দিনের নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অবগত হলেন এবং তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে দিলেন। আমরা আস্তে আস্তে কঠিন থেকে কঠিনতর রাস্তায় চলতে শুরু করলাম। কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কেহ কেহ বিরোধিতা করতে শুরু করলেন এবং কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন রকম বুঝিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে খারাপ ধারণা দিতে থাকলেন। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন তথা ট্রেড ইউনিয়নের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। আমরা যারা নেতৃত্বে ছিলাম তাঁরাও ভাবলাম যে, এখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। ১৯৮৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উৎকালীন মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি এখানে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবেনা বলে মত পোষণ করেন। রাষ্ট্রপতির অমতের বিষয়টি বিজয় নগরে অবস্থিত শ্রম দপ্তরে জানিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়।

তৎকালীন ওয়ার্কাস ফেডারেশনের নেতা নূরুল আনোয়ার ভাইয়ের সহায়তায় শ্রম আদালতের মাধ্যমে রায় নিয়ে ৩০৪৪ নং রেজিষ্ট্রেশন পাই। কর্তৃপক্ষ কঠোর থেকে কঠোরতম অবস্থানে চলে গেলেন। কোন অবস্থাতেই এখানে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড চালু করতে দেবেন না। আমরাও কর্তৃপক্ষকে নমনীয় করতে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব মরহুম মস্তান খান, আওয়ামী লীগের জনাব আ,ক,ম মোজাম্মেল হক, শ্রমিক লীগের আহসান উলাহ মাস্টার, জাতীয়তাবাদী দলের জনাব আব্দুল মান্নান, ওয়ার্কারস পার্টির রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খাঁন রনো, জাতীয় পার্টির আফজাল হোসেন কায়সার, ওয়ার্কাস ফেডারেশনের নূরুল আনোয়ার এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের জনাব নজরুল ইসলাম খান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা মরহুম এম এ মোত্তালিব সহ আরও বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে আমাদের যেতে হয়েছে।

১৯৯১ সালের দিকে বাইরের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে ভিতরের পরিস্থিতিও আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কিছু চাহিদাও কর্তৃপক্ষকে কিছুটা চাপে ফেলে। ফলে আস্তে আস্তে পরিস্থিতি অনিবার্য সংঘাতের দিকে যেতে থাকল। এসবের ভিতর দিয়ে একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। আর তা হলো ট্রেড ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক লেজুড় বৃত্তি করা। যার দরুন ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের নিজস্ব রাস্তা থেকে সরে এসে নিজেরাই শোষনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচেছ। আর এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন তার নিজস্ব অবয়ব ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ দেশের শ্রমজীবী শ্রেণী, সৎ এবং নিরীহ মালিকগণ। যাই হোক, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবী ও স্থানীয় জনগণের না পাওয়ার বেদনা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নাজুক আকার ধারণ করে। ১৯৯২ সালের ২৬ শে মে তারিখে ঘটে সবচেয়ে দু:খজনক ও লজ্জাকর ঘটনা। যার বর্ননা এখানে আর দিতে চাই না। একটি বড় রকমের বিপব সংগঠিত হলো। প্রশাসনে পরিবর্তন আসল। কিছুলোক কারা নির্যাতন সহ্য করল। পরবর্তীতে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলো। সিবিএ তথা ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন হলো । কিন্তু ২৬ শে মে এবং তার পরবর্তী ঘটনা তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মারফত সারাদেশ ব্যাপী প্রচার হল। সরকার ট্রেড ইউনিয়নটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করল।

অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে এসে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িয়ে যাওয়া ও সারা দেশের ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে বহু দেনদরবার তথা বহু ব্যক্তি ও দপ্তরে ধরনা দিতে গিয়ে দিনের পর দিন অর্ধহারে অনাহারেও থাকতে হয়েছে। আমার জীবনের দেখা সবচেয়ে উদ্যমী ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি সম্পন্ন মানুষটি হলেন ট্রেড ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারন সম্পাদক সেলিম মাহমুদ। ঘন্টার পর ঘন্টা ঢাকা শহরের বিভিন্ন অফিসে হেটে বেরিয়েছি। কত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু দমে যেতে দেখিনি কখনো। সভাপতি মরহুম ফরিদ উদ্দিনকে দেখেছি একজন অসীম সাহসী মানুষ হিসাবে, মরহুম ইউসুফ আলী সরকার ছিলেন থিংক ট্যাংক হিসাবে। উল্লেখিত তিনজনই আজ আমাদের মধ্যে নেই। সেলিম মাহমুদ চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে আমি নিজের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পিছনে। এই টাকা গুলো সংগ্রহ করতে হয়েছে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের দেয়া চাঁদা ও শুভাকাক্ষীদের কাছ থেকে । এটা আমার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

আজ আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়াই আমরা সক্ষম হয়েছি এখানে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে। আমরা প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অনন্য উচ্চতার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি শুনে যে, দেশের সেরা দশটি করদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরাও রয়েছি। আজ এই রজত জয়ন্তী উৎসবের মাধ্যমে আমি ভুলে যেতে চাই অতীতের ট্রেড ইউনিয়নে জড়িয়ে পড়ার সেই দু:সহ স্মৃতিকে, ভুলে যেতে চাই আমাদের মধ্যে কখনও কোন বিভেদ ছিল।

প্রতিষ্ঠানটিকে এমন একটি জায়গায় আমরা নিয়ে যাব, যা নিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম গর্ববোধ করবে। এটাই হোক আমাদের রজত জয়ন্তীর অঙ্গীকার।

--- o ---

হারিয়ে গেল জীবনের ২৫টি বছর

মোঃ দেলসাদ আলী
সিনিয়র পিসি গ্রেড-এ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী। ভাবতে অবাক লাগে, ২৫ টি বছর আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল। এই তো সেদিন পত্রিকায় দেখলাম সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্টে, গাজীপুরে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করা হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অনুসারে চেকার পদে দরখাস্ত, লিখিত ও ভাইবা দিয়ে নিয়োগপত্র পেয়ে কাজে যোগদান করলাম। আমরা যারা যোগদান করলাম তারা সবাই অল্প বয়সের যুবক। প্রতিষ্ঠানে তখনও আবাসিক ভবনসহ কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। তাই সাময়িকভাবে পুলিশ ব্যারাকে ঠাঁই হলো। অফিসের উৎপাদন এলাকার বিভিন্ন হলে ইলেট্রিক্যাল কাজ চলছে এবং ভল্টগুলোতে ফ্লোর ধোয়া মোছার কাজ চলছে। আমরা কেউ জানিনা, আমাদের কাজ কি ? বসার কোন জায়গা নেই । প্রতিদিন বিভিন্ন হলে গিয়ে কাজ দেখা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা। নির্দিষ্ট কোন কাজ না থাকায় যে যখন যা বলে তাই শুনতে হয়। এর মধ্যে আরও বেশী ভয় এমডি, জিএম সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চোখে পড়া কোন ভুলের জন্য শাস্তিস্বরুপ চাকুরী না চলে যায়। তারপর কনসোলেটেড-পে সহ বেতন সর্বসাকুল্যে ৮৯৫ টাকা মাত্র। সকাল ৮ টা হতে বিকাল-৫টা পর্যন্ত ডিউটি থাকলেও কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে হতো। এর জন্য অতিরিক্ত কোন ভাতা ছিল না । তারপরও চুন থেকে পান খসলে চাকুরী নেই। এই বাধ্যবাদকতার কারণে অনেকে চাকুরী ছেড়ে চলে গেছেন।

তৎকালীন এমডি কর্ণেল (অবঃ) মরহুম এ.কে.এম. সিকান্দার হোসেন ব্যাংক নোট প্রিন্টিং হলে মিটিং করে বলেন, আপনারা কাজ করে যান, বর্তমানে আমার হাতে কোন ক্ষমতা নেই, যখন ক্ষমতা পাব তখন সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। জানা মতে সুযোগ সুবিধার মধ্যে বেতন স্কেল দ্বিগুণ, ফ্রি ফার্নিশ কোয়াটারসহ আরো অনেক লোভনীয় অফার। কিন্তু সুযোগ সুবিধার পরিবর্তে, দেখা গেল নানা রকম অত্যাচার নিপীড়ন, কথায় কথায় চাকুরী নেই। এত কিছুর মাঝেও সততা, আন্তরিকতা ও আনন্দের কমতি ছিল না। বিশেষ করে ২১ শে ফেব্রুয়ারী পালনের জন্য সারারাত ফুল সংগ্রহ, মালা তৈরি এবং কাঠের তৈরি শহীদ মিনারে সকাল বেলা খালি পায়ে হেটে গান গেয়ে বেদীতে ফুল দিতে ভুলতাম না। আমাদের অনেকের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত-বিরোধ ছিল, কিন্তু কাজে সততা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কারো কোন বিপদ হলে একযোগে ঝাপিয়ে পড়তাম।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্ট, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাং) লিমিটেড এ রুপান্তরিত হলো। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে অনেক সুযোগ সুবিধা। এই সুযোগ সুবিধা এক দিনে আসেনি। এর জন্য অনেক দেন দরবার করতে হয়েছে সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলই এই রজত জয়ন্তী। হাউজ লোন, স্কুলের উন্নয়ন, জলকণাসহ সার্বিক সাফল্য বর্তমান এমডি জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানকে এতদূর এগিয়ে নেয়ার পিছনে যারা অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কেউ চাকুরী ছেড়েছেন, কেউ অবসরে গেছেন, কেউবা আবার আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আমরা যারা পুরাতন রয়েছি, তাদের একটাই মাত্র লক্ষ্য, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সততার সাথে কাজ করা। তাই

যাবার এই পড়ন্ত বেলায় নতুনদের কাছে প্রত্যাশা,'আপনারা সবাই পুরাতনদের পথ অনুসরণ করুন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে সততার সাথে কাজ করুন। প্রতিষ্ঠান বাঁচলে আমি আপনি বাঁচবো, আমরা বাঁচলে আমাদের পরিবার ও দেশ বাঁচবে। দেশ বাঁচলে আগামীতে আরও সূবর্ণ জয়ন্তীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করতে পারবেন।

--- o ---

টাকশালে আমার ২৫ বছর

মোঃ আমজাদ হোসেন
সিনিঃ সহকারী-গ্রেড-এ

পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি পেলাম, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজেক্ট, গাজীপুর এ বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করা হবে। সবে মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। বিজ্ঞপ্তি দেখে পেপার কাটিং বাসায় নিয়ে আবেদন করলাম। সহকারী পদে । চাকুরীটাও হয়ে গেল।

২৬-৬-১৯৮৮ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করার পর পোষ্টিং হলো ব্যাংকনোট ফিনিসিং হলে। ব্যাংকনোট ফিনিশিং হলে গিয়ে দেখলাম সকলেই আমার মত একই বয়সের প্রায়। শুধু তাই নয়, অত্র প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে সবাই ইয়ং। তবে কাজের ধরন ও কাজের নিয়ম কানুন অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রথমে শৃঙ্খলাবদ্ধতা খুব একটা ভাল লাগেনি। বনের পাখিকে যদি খাচাঁয় বন্দি করা হয় তাহলে পাখির যে অবস্থা হয় অত্র প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর নিয়ম-কানুন দেখে আমারও একই অবস্থা হয়। যে বয়সে চাকুরী নিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানে এসেছি সে বয়সে পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে চলে আসা খুবই কষ্টকর ছিল। ছুটি পেলেই চলে যেতাম মা-বাবার কাছে।

বাবাকে বলতাম, চাকুরী ভাল লাগে না। বাবা বুঝাতেন, চাকুরী করতে হবে। আমার ফ্যামিলি ও স্বজনদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাকুরীজীবি। চাকুরী আমার বেশী পছন্দ না হলেও চাকুরীতেই রয়ে গেলাম। অত্র করপোরেশনের ব্যাংকনোট ফিনিশিং হলে আমাকে পোষ্টিং দেয়া হলো। ব্যাংকনোট ফিনিশিং হলে যেদিন আমি গেলাম সেদিন হলের ভিতরে অফিস রুমে দুব্যক্তি বসা ছিল দুটি চেয়ারে। একজন বয়স্ক এবং অন্যজন একেবারেই ইয়ং। তবে দুজনই যে কর্মকর্তা তা আমার বুঝতে বাকী ছিল না। আমি অফিস রুমে ঢুকতেই একজন বয়স্ক কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?' । আমি আমার নাম বললাম। তিনি বললেন, ' ঠিকমত মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে'।

সময়ের বিবর্তনে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজেক্ট থেকে হয়ে গেল দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ, গাজীপুর-১৭০৩। তৈরি হলো অত্র করপোরেশনের চাকুরীর প্রবিধানমালা। শুরু হলো নূতন বিধিমালার আওতায় চাকুরীর জীবন যাত্রা। অত্র করপোরেশনে চাকুরী জীবনে স্মরণ করার মত তো অনেক কিছুই আছে যা লিখে শেষ করা যাবে না ।

পৃথিবী ঘূর্ণায়মান, সময় তার তালে তালে চলে-মানুষ তার কৈশোর জীবন থেকে যৌবনে চলে আসে আবার চলে যায় পৌঢ়ে বৃদ্ধ বয়সে। ১৯৮৮ সাল অনেক আগেই চলে গেছে। ২০১৩ চলছে। আমি ও আমার সহকর্মীরা যারা অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদান করেছি তারা এখন কোথায় আছে তা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব করার দরকার নেই; শরীরের গঠন, মনের অবস্থা সব কিছুতেই হিসেব সহজে মিলে যায়।

অনেক উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীতে ছিলেন, আবার অনেকে অবসরে চলে গেছেন, আবার অনেকে চাকুরী শেষ না করতেই চির বিদায় নিয়েছেন। চাকুরী শেষে আমরা অবসরে যাওয়ার জন্য যাদেরকে বিদায় দিয়েছি তাদেরকে কত উপহার সামগ্রী দিয়ে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছি। আর যারা চাকুরী শেষ না করতেই চিরবিদায় নিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাদের জানাযায় শামিল হয়ে সাদা কাফন পড়িয়ে বিদায় দিয়েছি চোখের জলে । এই তো জীবন ।

ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আমি অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কাজ করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম। কিন্তু পদোন্নতি নীতিমালার আওতায় প্রশাসন বিভাগের একটি ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় আমার পদোন্নতি রহিত হয়ে গেলো। প্রশাসনের ভুলটি পরিচালক পর্ষদ পরবর্তীতে চিহ্নিত করলেও আমি আজও তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্য করছি। অথচ পছন্দনীয় লোকজনের পদোন্নতি দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ অনেক সময় পদোন্নতি নীতিমালা পরিবর্তন বা সংশোধন করেছে।

--- o ---

" শুধুই আমার স্মৃতি থেকে "

মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

'টাকশাল' এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'রজত জয়ন্তী' পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষ্যে করপোরেশনের স্মৃতিমূলক লেখা আহবান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রায় ২৫ বছর চাকুরী জীবনে কত-না স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। সাহিত্য/গল্প লেখার অভ্যাস নেই, তারপরও স্মৃতি হতে লিখতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে লেখা শুরু করলেও তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোন্‌টি বাদ দিয়ে কোন্‌টি লিখব তা নির্ধারণ করাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাহোক ১৯৮৮ সালের ১৩ এপ্রিল হতে "সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্ট" বর্তমানে "দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ" (টাকশাল)- এ 'অফিসার' পদে চাকুরী জীবন শুরু করি। সরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তা নিয়োগকারী সংস্থা 'ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট' তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে একটি ব্যাচ-এ সম্ভবত আমরা ১১ জন অফিসার পদে যোগদান করি। ঐ ব্যাচ-এর একমাত্র আমিই বর্তমানে করপোরেশনে কর্মরত আছি। অন্যরা সকলেই বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য জাতীয়করণকৃত ব্যাংক ও ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরীতে চলে গেছেন। ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট এর মাধ্যমে ১টি লিখিত পরীক্ষার বিপরীতে ব্যাচের সকলেই ২/৩টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম। যোগদানের কয়েকদিন পর আমিও জনতা ব্যাংকে অফিসার পদে নিয়োগ পত্র পাই। তবে, ভবিষ্যতে টাকশালের বেতন কাঠামো জাতীয় বেতন কাঠামোর তুলনায় ২গ্ন গুণ হবে, বিনা ভাড়ায় সু-সজ্জিত বাসস্থান হবে; এসব জানার পর তখনকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণেল (অব) সিকান্দার হোসেন (বর্তমানে পরলোকগত) স্যারের মতামত চাইলে তিনিও বলেন, তোমরা ১ম ব্যাচের অফিসার ভবিষ্যতে উপরে উঠার সুযোগ পাবে বিধায় থেকে যাওয়া ভাল। টাকশাল-তো পৃথিবীর সব দেশে নেই, বাংলাদেশে এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু আমার বাড়ী শ্রীপুর, গাজীপুর হওয়ায় পারিবারিক, ভৌগলিক ও উপরোক্ত কারণে টাকশালের চাকুরীতেই থেকে যাই। আমার ব্যাচের উল্লেখযোগ্য একজন কর্মকর্তা, জনাব খুরশেদ আলম, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের মিরপুরস্থ ট্রেনিং একাডেমিতে মহাব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত আছেন।

চাকুরীর শুরুতে ১ম কয়েকদিন প্রশাসন বিভাগে অতঃপর প্রায় ১৪ বৎসর অর্থ ও হিসাব বিভাগে এবং এরপর হতে অদ্যাবধি প্রায় ১১ বৎসর ক্রয়-বিক্রয় বিভাগে কর্মরত আছি। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্ণেল (অব) সেকান্দার হোসেন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোহসিনুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাহচর্যে, নির্দেশ, নির্দেশনা, পরামর্শ চাকুরীর শুরুতেই পাওয়ায় পথচলা সহজ মনে হয়েছিল।

নবীন অফিসার হিসাবে যোগদানের কয়েক মাস পর ০১দিন অফিস ছুটিশেষে হেঁটে থার্ড গেইট এর কাছে যেতেই আমার কাছে ১টি প্রাইভেট কার থামে, চেয়ে দেখি সেকান্দার স্যার গাড়ীতে বসা। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, স্যার বললেন গাড়ীতে উঠ, আমি বললাম স্যার আমি চৌরাস্তা হয়ে শ্রীপুর বাড়ীতে যাব; তারপরও তিনি বললেন উঠ, চৌরাস্তায় নেমে যেও; তারপর উঠে চৌরাস্তা নেমে গেলাম যা আজও ভুলিনি। শুরুতে আমাকে ডি-৭নং বিল্ডিং এর ৫ তলায় ব্যাচেলর হিসাবে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়, পরবর্তীতে ডি-১নং বিল্ডিং এ ব্যাচেলর হিসাবে বসবাস করি। তখন বিভিন্ন বিভাগ হতে আন্তঃবিভাগ খেলাধূলার আয়োজন করা হতো। বিভিন্ন বিভাগ হতে পিকনিকের আয়োজন করা হতো। আমরা ব্যাচেলর কর্মকর্তা একই বৎসর একাধিক পিকনিক-এ অংশগ্রহণ করতাম। সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ব্যানার, গাড়ী নিয়ে অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কাজের তথা উৎপাদন

পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিকালীন কাজের চাপ বিশেষ করে সিলিং অতিরিক্ত অতিকালীন কাজ থাকায় যা সম্ভব হয় না।

অর্থ ও হিসাব বিভাগে জনাব আবুল হাশেম ভূইয়া, তৎকালীন সহকারী ব্যবস্থাপক, যিনি পাকিস্তান সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন হতে একাউন্টিং এর উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং তিনি সম্ভবত সি,এ (ইন্টার) পাশ ছিলেন তাঁর সাথে কার্যক্রম শুরু করি। বুনিয়াদি কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় হাতে কলমে কাজ করতে করতে (ড়হ ঃযব লড়ন ঃৎধরহরহম) শিখতে হয়েছে। অর্থ ও হিসাব বিভাগে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিল অপর্যাপ্ত। সহ-ব্যবস্থাপক জনাব হাশেম, উপ-ব্যবস্থাপক জনাব খাজা আব্দুল মোমেন ও আমাকে অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে অফিস সময়ের পরও প্রচুর সময় দিতে হতো; তখন কোনরূপ সম্মানী/টিফিনভাতার প্রচলন ছিল না। হাশেম সাহেবের ডি-৩নং বাসায় খাজা মোমেন স্যার সহ আমরা ছুটির পর রাত পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই বড় বড় শীট নিয়ে বিভিন্ন আইটেম/নোটের কস্টিং করেছি; যা বর্তমানে কম্পিউটার এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলকরণের জন্য সে-কি কষ্ট। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন ক্যালকুলেটর টিপে কয়েকজন মিলে একটি মাসের হিসাব মিলাতে পারলে আনন্দের সীমা থাকত না। নির্ধারিত দিনে মাসের বেতন প্রদানের লক্ষ্যে কোন কোন সময় বেতন শাখা ছাড়াও অন্যান্য শাখার জনবল সহকারে অন্য কাজ বন্ধ রেখে বেতন প্রস্তুত করতে হতো যা বর্তমানে কম্পিউটার এর কল্যাণে অল্প শ্রম ও সময়ে করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সর্বজনাব মোহসীনুর রহমান, আঃ সামাদ, তোফাজ্জল হোসেন ডিজিএম হিসাবে প্রেষণে নিয়োজিত হলেও সবাই যথেষ্ট প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও দাপটের সাথে কাজ-কর্ম পরিচালনা করতেন। তোফাজ্জল স্যার যখন অর্থ ও হিসাব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তখন এক পর্যায়ে আমি করপোরেশনের বাজেট প্রস্তুত করতাম। বোর্ড মিটিং এ বাজেট পেশের প্রাক্কালে তাঁর চেম্বারে বসে আমাকে নিয়ে চর্চা করতেন, রুমে কেউ প্রবেশ করলেই বলতেন সামনে পরীক্ষা, প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের থার্ড ফ্লোরে বোর্ড মিটিং চলাকালে স্যারসহ আমরা নথিপত্র নিয়ে পাশের রুমে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, খুব টেনশনে আছি, কখন কি জিজ্ঞেস করে বসে, মিটিং শুরু হলে আর বাথ রুমে যাওয়া যাবে না, যদি ডাক পড়ে যায় ইত্যাদিতে আমরা ভীষণ আনন্দ পেতাম।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক এর জনাব রুহুল আমিন স্যারের সময় করপোরেশনের প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মহাব্যবস্থাপক জনাব খান আব্দুস সোবহান। এফডিআর ও এলসির জরুরী কাজে মাঝে মধ্যেই ঢাকা যেতে হতো। একদিন এফডিআর ও এলসির কাজে ঢাকা যেতে হবে, কিন্তু অফিসের গাড়ী নেই। শিমুলতলীতে বাস না পেয়ে টেম্পুতে রওনা হই। সোনামনি কিন্ডারগার্টেনের সামনে মোড় ঘুরানোর সময় টেম্পো দুর্ঘটনা ঘটে, সেটি কাত হয়ে পড়ে যায়। আমার এক হাতে ব্রিফকেস, আরেক হাতে রড ধরে টেম্পো হতে বের হই। কয়েকজন আহত হয়, কারও হাত ভাঁঙ্গে, কারও পা আটকে থাকে ইত্যাদি। আমার চোখে বালি যায়, গায়ের শার্ট ছিড়ে যায়। বাসায় ফেরত এসে শার্ট পরিবর্তন করে আবার রওয়ানা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যাই। রুহুল আমিন স্যারের স্বাক্ষর/অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন থাকায় তার চেম্বারে যেতে দুপুর হয়ে যায়। তিনি প্রয়োজনীয় কাজ শেষে জিজ্ঞেস করলেন, অফিসের গাড়িতে এসেছেন? আমি পাবলিক বাসে যাওয়ার কথা জানাতেই বললেন; আগামীকালতো আবার আপনাকে আসতে হবে, সোবহান সাহেবকে বলবেন আগামীকাল গাড়ী দেয়ার জন্য। যথারীতি পরদিন অফিসের গাড়ি নিয়ে ঢাকা যাই।

টানা প্রায় ১১ বৎসর ক্রয়-বিক্রয় বিভাগে কাজ করার সুবাদে টেন্ডার সংশ্লিষ্ট অসংখ্য মিটিং এ অংশগ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন স্যারের সময়কার মিটিংগুলো ছিল অনেকটা প্রাণবন্ত অর্থাৎ ঐসব মিটিং এ আলোচনার ফাকে অথবা আলোচনা শেষে মাঝে মধ্যে হাসির খোরাক পাওয়া যেত। মূলতঃ তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক খন্দকার নূর আলম স্যারের স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসঙ্গে গমের আটার রুটি খাওয়া, পর্যাপ্ত শাক-সবজি খাওয়া, টাকশালের পাশের শিমুলতলী, ঢাকার বাদামতলী বাজারের বিভিন্ন আইটেমের মূল্যের তুলনা, বোর্ডরুমের কার্পেটের উপর মরনিং ওয়ার্ক করায় কার্পেট ক্ষয় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মামুন স্যারের সাথে আলোচনায় হাসির সুত্রপাত হতো। কোন কোন টেন্ডার মিটিং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত করপোরেশনের লিয়াজোঁ অফিসে অনুষ্ঠিত হত। মিটিং উপলক্ষ্যে মামুন স্যার লিয়াজোঁ অফিসে অবস্থান করতেন। গাজীপুর হতে যাওয়ার সময় সাধারনত হোটেল হতে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে লিয়াজোঁ অফিসে যেতাম। রাস্তায় যানজটের কারণে মাঝেমধ্যে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে যেত এবং ক্ষুধায় সবারই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম আবদুল আউয়াল স্যার করপোরেশনের ক্রয়-বিক্রয় বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন যিনি আবার মামুন স্যারের একই ব্যাচম্যাট। মামুন স্যার কিছুক্ষণ পরপর ফোনে জিজ্ঞেস

করতেন, কোথায় আছেন, কতক্ষণ লাগবে, জবাবে আউয়াল স্যার বলতেন এই এসে গেছি, আর অল্প সময়, কিন্তু সময় আর শেষ হতো না। আউয়াল স্যার বলতেন, কত বিপদ-আপদের দোয়া আছে কিন্তু যানজটের কোন দোয়া আছে কি-না জানি না, থাকলে ভালো হতো ইত্যাদি হাস্যরসে পুরো রাস্তা জমিয়ে রাখতেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তওফিকুর রহমান ছিলেন নরম প্রকৃতির ও সুন্দর মনের মানুষ। একদিন জিএম, সোবহান সাহেব এমডি স্যারের চেম্বারে টেবিলের সামনে জুতা হাতে নিয়ে স্যারকে বলেন, স্যার বেয়াদবী নিবেন না, বলেই জুতা টেবিলে রেখে আবার বললেন 'জুতা-তো' নমুনা বাছাই করতে হবে। এনিয়ে উপস্থিত সকলের মাঝেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মহোদয়ের জ্ঞানের গভীরতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান, সাহসী পদক্ষেপ ও গতিশীল নেতৃত্বের তুলনা পাওয়া কঠিন। স্যারের সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন মেশিন নিয়ে কথা বললে মনে হয় তিনি একজন দক্ষ প্রকৌশলী, বাংলা ও ইংরেজী পত্র/বক্তব্য লিখার ক্ষেত্রে মনে হয় স্যার উভয় বিষয়েই সম্মান ডিগ্রী নিয়েছেন। করপোরেশনের সকল বিষয়ই স্যারের নখদর্পণে রয়েছে। করপোরেশনে কিছু বিষয় বহু বছর যাবত বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছিল না; যা স্যারের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। যেমন ঃ কবরস্থানের ব্যবস্থা করা, মসজিদে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা, সর্বাধুনিক মডেল ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মেশিন ক্রয় করা, হাউজ বিল্ডিং লোন প্রচলন, জলকণা তৈরী করা, করপোরেশনের বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, নতুন আঙ্গিকে বিজয় দিবস, শহীদ দিবস উদযাপন, আবাসিক এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি যা করপোরেশনের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পরিশেষে টাকশালের উন্নয়ন কামনা করে, স্মৃতির ঢালি বন্ধ করে, আল্লাহতালার দরবারে হাজার শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, সমস্যা সঙ্কুল পৃথিবীতে সুস্থ অবস্থায় বেচে আছি; আলহামদুলিল্লাহ।

--- o ---

স্মৃতির বিষণ্ন বেলুন

সুলতান আহমেদ
ব্যবস্থাপক

সময়টা ১৯৯৬ সাল। অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদানপূর্ব ডাকা হয়েছিল আমাকে প্রয়োজনীয় কিছু কাগজ-পত্র জমা দেয়ার জন্য। সংগে নিয়েছিলাম আমার এক সতীর্থ রাশেদ ভাইকে, যিনি টাকশাল চেনেন। টঙ্গী পর্যন্ত এসেছি অনেকটা আনন্দপূর্ণ উত্তেজনা নিয়ে, কিন্তু তারপর পথের বাঁকে বাঁকে টাকশাল খুঁজি-এই বুঝি এসে গেছি। না, দেখা মেলেনা, দূরে আরও দূরে...। আমার খুশীর আলোরা ম্লান হতে থাকে। অচেনা পথ যেন আরও দীর্ঘ হয়। দীর্ঘ একযুগেরও অধিককাল ঢাকায় থাকার মোহমায়া কাটাতে হবে ভেবে মনটা যেন কেমন করে ওঠে। সকল উঁচু উঁচু দালানগুলো নিচু হ'তে হ'তে টিনশেডে এসে ঠেকেছে। ভাবনায় ছিল, টাকশালও বুঝি টিনশেডের একটি লম্বা প্রতিষ্ঠান, কাঁচা রাস্তার পাশে পথচারীকে পথ ছেড়ে দিয়ে অবগুণ্ঠিত কোন কুল নারীর মত দাঁড়িয়ে থাকা যেন।

থার্ড গেটে এলাম। নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীদের আন্তরিকতা ভাল লাগলো। একজন দূরাগত অতিথির কাছে এটা বোধ হয় বড় পাওয়া ঐ মূহুর্তে, বলতে পারি ভাল লাগাটা শুরু। ভিতরে এলাম। অসংখ্য পাখীর কল-কাকলী আর সবুজ প্রকৃতির কোলে দীর্ঘ লম্বাটে প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক স্থাপত্য নকশার এক অপূর্ব সমাহার, দেখে ভাল লাগাটা বেড়ে গেল। আমার পূর্বের ভাবনায় টিনশেডের কথা মনে হতে নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেলাম। একটা উচ্চ নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান হবে টিনশেডের! কেন এমন অদ্ভুত ভাবনাটা মাথায় এসেছিল?

লবিতে অফিস প্রেরিত পত্রটি দেখালে-খান আব্দুস সোবহান, তৎকালীন জিএম-এর কাছে পাঠানো হলো। (স্যার এখন কোথায়,

কেমন আছেন? তাঁর জন্য সকল শুভ কামনা।) কেউ একজন নিয়ে এলো আমাকে। স্যার আমার বিষয়ে কিছু খোঁজ-খবর নিলেন এবং এক পর্যায়ে আমাকে কিছুটা অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-এখানে আমি চাকুরীটা করবো কিনা? অর্থাৎ ঢাকা ছেড়ে এতদূরে এসে চাকুরীটা 'কন্টিনিউ' করবো তো- এরকম একটা ভাবনা থেকে সস্নেহ এ প্রশ্ন স্যারের। কয়েক ঘন্টা আগে এমন প্রশ্ন হলে আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতাম। কিন্তু এখানে এসেই আমি টাকশালের প্রেমে পড়ে যাই। এর কঠোর নিয়ম-শৃংখলা, সময়ানুবর্তিতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সব কিছুতে একটা সু-শৃংখলতার ছাপ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দেখে।

যোগদান করলাম, কিন্তু অভিষেকের গৌরব নেই। বিপরীতটাই ছুঁয়েছিল আমাকে। চারুকলা ইনষ্টিটিউটে অনেকটা স্বাধীন জীবন-যাপনের পর, অফিসের নিয়ম-নিগড়ের এই বন্ধন মেনে নিয়েছিলাম সানন্দে। কিন্তু এই প্রাথমিক ভাল লাগার পর মোহমুক্তি ঘটতে থাকে কিছু দিনের মধ্যে। মাঝে মাঝে মনে হতো, বের হয়ে লবির সামনে গিয়ে দাঁড়াই, কখনওবা মাঠে গিয়ে হাঁটতে থাকি ইচ্ছেমত। (এখনও এই বাসনা হয় কখনও-সখনও)। ব্যাপারটা ইজহারুল হক, তৎকালে ডিজিএম পরবর্তীতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্যার বুঝতে পেরেছিলেন, বলেছিলেন হাতে কাজ না থাকলে সামনের দিকে বের হতে পারেন। এতটাই আমাকে পড়তে পেরেছিলেন চৌকস এই আধুনিক মনের মানুষটি। কিন্তু অফিসতো অফিস। এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা গৌণ। মেনে চলাটা আরও সঙ্গত।

অফিস সময় সকাল সাড়ে ছ'টা, পরে সাতটা। ঘুম থেকে উঠতে হয় সাড়ে পাঁচটা/ছ'টায়। অত সকালে ওঠার অভ্যেস নেই। খেতে ইচ্ছে করে না কিছুতে। চোখ থেকে ঘুম যায় না। তবু শাওয়ারের নীচে দাঁড়াই, দাঁড়াই ঠিকই কিন্তু আমি বোধ হয় ঘুমাই তখনও। চোখ মেলতে পারি না। ছুটোছুটি করে অফিসে যাই। নিরাপত্তা এলাকায় খাবার নেয়া যায় না। অফিসে খাওয়ার জন্যে দু'টো-তিনটে রুটি, পাতলা ধরনের ডাল/ভাঁজি অথবা চিড়ে ভেঁজা আখের গুড়ে খাওয়া (যার পুষ্টিমান সমন্ধে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না)। দু'তিন ঘন্টার মধ্যে আবার ক্ষুধা লাগতো। অথচ থাকতে হবে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। আর কোথাও খাবার পাওয়া যায় না, শিমুলতলী ছাড়া। সেকশনে কোন 'হেল্পিং হ্যান্ডস্' ছিল না (এখনও নেই) যাকে দিয়ে আনানো যায় কিছু। এক সময় গ্যাস্ট্রিকে আক্রান্ত হই। ব্যথা, ক্ষুধা নিয়ে সিঁড়ি বারান্দায় দাঁড়াই। পায়চারী করি। সময় চলে টিক্‌টিক্-টিক্‌টিক্।

একদিন আবেদন করি কর্তৃপক্ষ বরাবর, সকালে উৎপাদন এলাকার সময় থেকে আমাদের সেকশনের অফিস সময় পরিবর্তন করে প্রশাসন এলাকার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে। যুক্তি এই যে, উৎপাদনের সাথে আমাদের সরাসরি কোন সম্পর্ক না থাকায় উৎপাদন ব্যহত হওয়ার মত কোন প্রভাব ফেলবে না। কর্তৃপক্ষ যুক্তি আমলে নিয়ে অফিস সময় পরিবর্তন করে দেন, যা এখনও বহাল আছে। ফলে সমস্যা অনেকটাই সামলে ওঠা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে তুরাগ নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। কেমন ছিল আমার চাকুরীর এই যাবৎকাল ? না, 'আইডার' (উরফবৎ) হংসের (উত্তর সাগরের পাখি) পালকের মত কোমল ছিল না, গাজীপুরের ভূ-প্রকৃতির মত উঁচু-নিচু, চড়াই-উৎড়াই রয়েছে, আছে খানা-খন্দও। একটা গল্প বলি পাঠক-

বনভূমিতে একটা হরিণ শাবক লাফাচ্ছে-দাফাচ্ছে আকাশমুখী। বাঘ-কুমিরের ভাল লাগেনি তা। জলের তলে লুকিয়ে ছিল কুমির, ঝোঁপের আড়ালে বাঘ। একদিন ঘাড় মটকে দিতে ঝাপিয়ে পড়লো শিকারী। কাছে-পিঠে ছিলেন কোথাও রাজ্যের রাজা, জনগণের সুখ-দুঃখের খোঁজ নিতে। রক্ষা করলেন তিনি হরিণ শাবককে, মুমূর্ষ অবস্থায়। বাঁচালেন কিন্তু অঙ্গহানি ঠেকানো গেল না। হরিণ শাবক এখন নিজ আঙ্গিনায় থেকে বনভূমি দেখে, আকাশ দেখে-আর আকাশ দেখে। আকাশ ছোঁয়ার কথা ভাবে কী ? আমার গল্প ফুরোলো কিন্তু নটে গাছটি মুড়োনো এখনও বাকী।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকলো পাঠক ? না, আমি বিস্মৃত হইনি যে স্মৃতিচারণ করছি। এ হলো শিল্পের আড়াল-আবডাল। প্রতীক, উপমা-উপমান, উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ছত্র-ছায়া।

চাকুরীর যাবৎকালে কেমন আছি আমি ? কতটা রক্তক্ষরণ ভেতরে-বাইরে ? বলতে পারবেন অত্র-প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ চিকিৎসা-কর্মকর্তাগণ। যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপেন রক্তের উচ্চচাপ-নিম্নচাপ। 'প্রেসক্রাইব' করেন। সেই আমার নিত্যসঙ্গী। তবু ভাল আছি। ভাল যে থাকতে হয়। ঙঢ়ঃরসরংঃ-দের দলে নাম লেখাই। ভাবি- "জীবন সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা"।

--- o ---

টাকশাল আমার দ্বীনি মেহনতের হাতেখড়ি

মোঃ আমিনুল ইসলাম
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট

১৯৮৭ এর ১ জুন তৎকালীন সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রজেক্ট এ যোগদান করার পর রানা কনস্ট্রাকশন কর্তৃক নির্মিত দোচালা টিনের ছাউনির এবং বাঁশের বেড়ার ছোট্ট মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে দেখতাম, নামায শেষে ৩/৪ জন হুজুর গোছের লোক লম্বা জুব্বা পড়ে মাথায় কালো পাগড়ী/টুপি, গালভরা দাড়ি নিয়ে বড় আকুতি মিনতির সাথে হাত ধরে বলত, 'ভাই একটু সময় বসা যায় না?' আল্লাহর ঘরে বসলে আল্লাহ তায়ালার রহমতের ফেরেস্তারা দোয়া করে; মেহেরবাণী করে একটু বসেন।' তখন জিজ্ঞাসা করতাম, বসলে কি হব? তখন তারা বলতো, হাদিসে পাকের তালিম হবে, গাস্ত হবে, দ্বীনি আলোচনা হবে, মাশওয়ারা হবে, বাসায় দ্বীনি তালিমের আলোচনা, বেরুনী গাস্ত, মহল্লায় রোজানা ২.৫০ ঘন্টার যিকির, মাসে ৩ দিনের, বৎসরে ৪০ দিনের, জীবনে ১২০ দিন বা ৪ মাস বা তিন চিল্লার জন্য বের হয়ে কিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি হাসিল করা যায় তা তারা বলতেন। প্রথম প্রথম উপরোক্ত কথাগুলো না বুঝলেও, বিরক্ত লাগলেও, মন না চাইলেও হুজুর লোকগুলোর সম্মানার্থে এবং লজ্জায় হলেও বসতাম।

মুরুব্বী হুজুররা হলেন, শ্রদ্ধাভাজন সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী জনাব আবদুল জলিল, ব্যবস্থাপক এবং ডাক্তার মোঃ শহিদুল হক, পার্ট টাইম মেডিকেল রিটেইনার। এইভাবে তাদের সাথে বসতে বসতে, তাদের কা শুনতে শুনতে তাদের সাথে চলতে চলতে তাদের মহব্বত ছহবতে থাকতে থাকতে মহান রাব্বুল আলামিন কিছুটা হলেও তা দ্বীনের (পরিবর্তনের) ছোঁয়া আমার গায়ে স্পর্শ করেছে যা নিজের ছবি দেখেই অনুমেয়।

তারই সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মহানুভবতায়, সহযোগিতায়, অকৃত্রিম ভালবাসায়, বিচক্ষনতায় এবং সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনায় আজ সিংহভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাথা গোজার ঠাঁই হিসেবে উত্তরায়/ঢাকায়, গাজীপুরে নির্মিত হয়েছে আবাস্থল/বাড়ীঘর। করে দিয়েছেন মৃত্যুর পর দাফনের জন্য কবরস্থান। সংস্থাপন করেছেন মুসল্লীদের জন্য মসজিদে এসি, বানিয়েছেন বিনোদনের জন্য পিকনিক স্পট 'জলকণা'। বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার সুবিধার্থে বিশাল ফুটপাত ও স্কুল সংলগ্ন শহীদ মিনার। তাই প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করাই হবে শুকরিয়া।

দীর্ঘ ২৫/২৬ বৎসর চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের সাথে তৈরি হয়েছে হৃদয়ে গভীর সম্পর্ক। তাদের সন্তানেরা আমাকে চেনে আমিনুল চাচা আর ভাবীরা/এম্প্লয়ীরা চেনে আমিনুল ভাই হিসেবে। কারণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে জুনিয়র কেয়ারটেকার পর্যন্ত এমন কোন ঘর/বাসা নেই যার দরজায় আমার পদচারণ হয়নি। হয় চিকিৎসার কারণে না হয় দ্বীনের দাওয়াত দিতে।

বিগত জীবনে আরও ৩টি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করলেও স্মৃতিচারণ করার মত কোন ঘটনা আমার মনে পড়েনা। কিন্তু টাকশালে আমার পুরো টগবগে যৌবন শেষ করে বার্ধ্যক্যে পৌঁছে পুরো জীবনটাই স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

আল্লাহ হাফেজ।

রজত জয়ন্তী

১৯৮৮-২০১৩

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন হতে যারা অবসরে গেছেন...

জনাব খান আব্দুস সোবহান, উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক

জনাব খন্দকার নুর আলম, মহাব্যবস্থাপক

জনাব শাহাব উদ্দিন আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী

জনাব মোঃ মজিবর রহমান আকন্দ, মহাব্যবস্থাপক

জনাব খাজা আব্দুল মোমেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক

জনাব সৈয়দ খলিলুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক

মিসেস মাহমুদা খাতুন, চীফ ডিজাইনার

জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ, ব্যবস্থাপক

জনাব মোঃ মোসলেম আলী, উপ-ব্যবস্থাপক

জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, উপ-ব্যবস্থাপক

জনাব মোঃ সেলিম মিয়া, নিরাপত্তা কর্মকর্তা

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল পাশা, সহকারি নিরাপত্তা কর্মকর্তা

জনাব মোঃ আবু জাফর মিয়া, এটিও

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, মাস্টার টেকনিশিয়ান

জনাব খন্দকার লিয়াকত আলী, সি. নিরাপত্তা সহকারী

জনাব মোঃ ফজলুল হক, সি. নিরাপত্তা সহকারী

জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন শেখ, সি. নিরাপত্তা সহকারী

জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সি. নিরাপত্তা সহকারী

জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, অঃ ইঃ অপারেটর

জনাব মোঃ মকবুল ইসলাম চৌধুরী, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ হানিফ, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব মোঃ খায়রুল আলম, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব আবু ইয়াকুব মোঃ মোস্তফা চৌধুরী, নিরাপত্তা প্রহরী

জনাব পরিমল কুরাইয়া, জুনিয়র কেয়ারটেকার

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, কেয়ারটেকার গ্রেড-এ

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন -এ যারা নির্বাহী প্রধান ছিলেন

জনাব মোঃ আবুল কাশেম

জনাব রুহুল আমিন

জনাব মাহাবুবুল হক

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন খাঁন

জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী

জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী

জনাব খুরশিদ-উল-আলম

জনাব কে, এইচ তৌফিক আহমেদ

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন

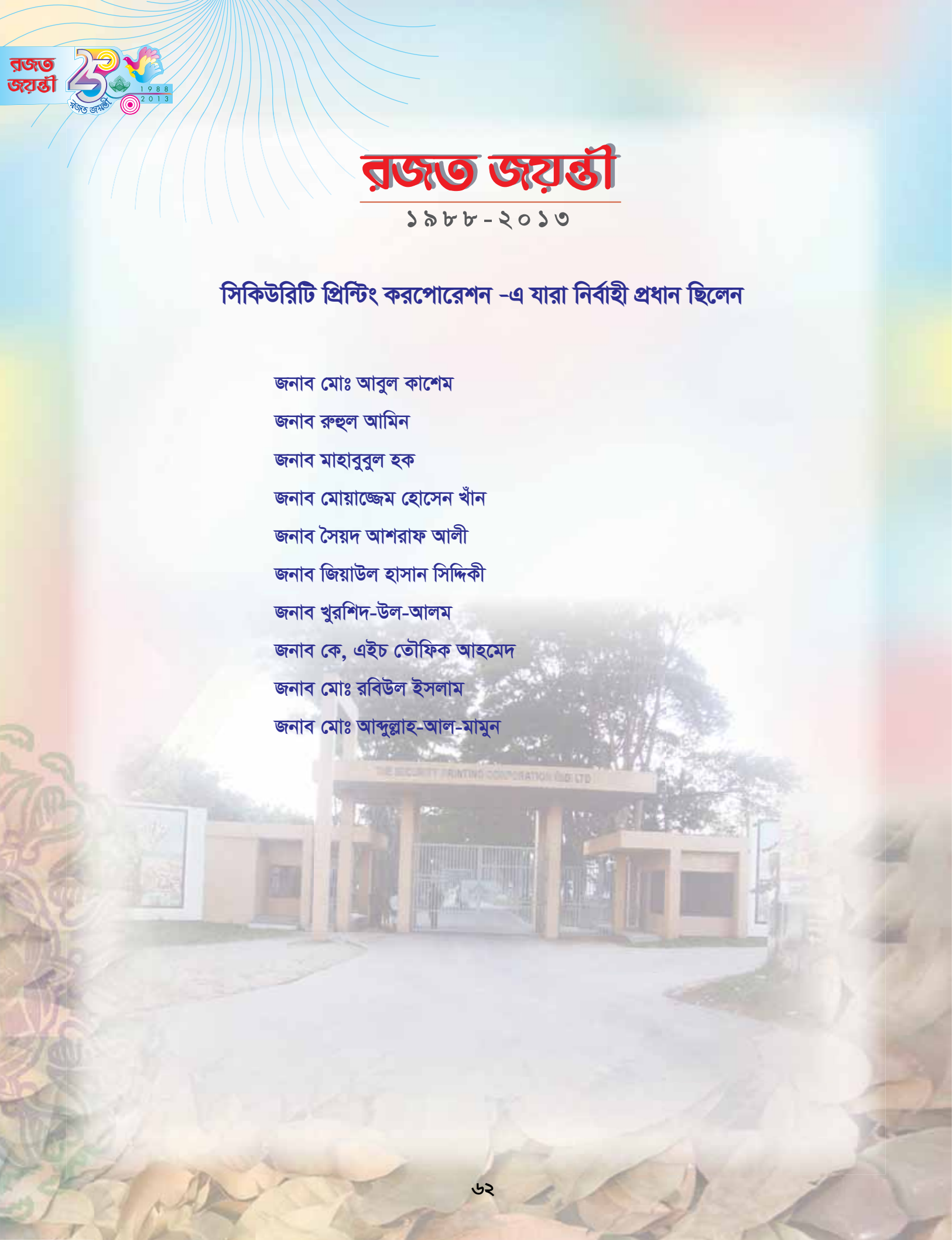

স্মৃতির পাতায়...

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
গাজীপুর-১৭০৩

স্মৃতির পাতায়...

পুনর্মিলনীতে গভর্নর মহোদয়

করপোরেশন পরিদর্শনকালে গভর্নর মহোদয়

নামাজ ফেরত গভর্নর মহোদয়

করপোরেশনের আভ্যন্তরিন অনুষ্ঠানে গভর্নর মহোদয়

স্মৃতির পাতায়...

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখছেন গভর্নর মহোদয়

স্মৃতিময় দৃশ্য

সংগিতানুষ্ঠান উপভোগরত দর্শকবৃন্দ

সংগিতানুষ্ঠান উপভোগ করছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও গভর্নর মহোদয়

স্মৃতির পাতায়...

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় নৃত্য পরিবেশরত শিশুরা

করপোরেশন পরিদর্শনে গভর্নর মহোদয় ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

করপোরেশন পরিদর্শনে গভর্নর মহোদয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

বৃক্ষরোপন অভিযান

স্মৃতির পাতায়...

বৃক্ষরোপন করছেন গভর্নর মহোদয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

বৃক্ষরোপন করছেন গভর্নর মহোদয়ের সহধর্মীনি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

মৎস শিকার

করপোরেশনের 'জলকণা'

স্মৃতির পাতায়...

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্যরা

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে অন্যান্যরা

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্যরা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগরত দর্শকবৃন্দ

স্মৃতির পাতায়...

২৬ মার্চ -এর র‍্যালী

২৬ মার্চের অনুষ্ঠিতব্য ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

২৬ মার্চের অনুষ্ঠিতব্য ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ী ট্রফি হাতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

২৬ মার্চের অনুষ্ঠিতব্য রক্তদান কর্মসূচী

স্মৃতির পাতায়...

২১ -এর প্রভাত ফেরীতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী

২১ -এর প্রভাত ফেরীতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী

বিজয় দিবসের শিশু চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা

২১ -এর প্রভাত ফেরী

স্মৃতির পাতায়...

২১ -এর প্রভাত ফেরীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

২১ -এর প্রভাত ফেরীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

করপোরেশনের শহীদ মিনারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

করপোরেশনের মসজিদ

স্মৃতির পাতায়...

পুলিশ ব্যারাক

কর্মচারী ক্লাব

মেডিকেল সেন্টার

করপোরেশনের শহীদ মিনার নির্মানকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
১	**জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ**	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	19-Sep-07
মহাব্যবস্থাপক বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	মহাব্যবস্থাপক	3-Dec-84
২	জনাব মাহাবুবার রহমান	প্রধান প্রকৌশলী	25-Aug-08
৩	জনাব মোঃ কালিমুল্লা	মহাব্যবস্থাপক	31-Dec-85
৪	জনাব মোঃ আদম আলী	ঐ	31-Dec-85
৫	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	ঐ	13-Jan-85
৬	জনাব মোঃ এহ্‌তেশামুল করিম	ঐ	16-Apr-89
৭	জনাব রশিদ আহমেদ	ঐ	24/07/89
উপ মহাব্যবস্থাপক বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	ডাঃ নূর মোহম্মদ আলী আজম	প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা	16-Mar-88
২	জনাব মোঃ মুছলিম মিয়া	উপ-মহাব্যবস্থাপক	5-Dec-85
৩	জনাব মোঃ আবু সাঈদ	ঐ	22-Sep-87
৪	জনাব সৈয়দ আমজাদ হোসাইন	ঐ	23-Jul-89
৫	জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির	ঐ	23-May-89
৬	জনাব মোঃ মমিনুল হক	ঐ	11-Aug-97
৭	জনাব মোঃ জামিল আকতার শাহ্‌জাদা	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	22/04/83*
৮	জনাব মোঃ বজলুর রহমান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	25-Nov-84
৯	জনাব মোঃ খসরুজ্জামান	ঐ	25-Nov-84
১০	জনাব মোঃ হাবিবুলাহ্‌	ঐ	1-Jul-89
১১	জনাবা দেলোয়ারা বেগম	ঐ	5-Sep-89
১২	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ	ঐ	13-Apr-88
ব্যবস্থাপক বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	জনাব মোঃ মস্তাফিজুর রহমান	ব্যবস্থাপক	7-Dec-88
২	জনাব মোঃ শামসুল করিম	ঐ	10-Dec-85
৩	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	ঐ	11-Nov-76
৪	জনাব মোঃ মাহবুবুল হক	ঐ	26-Aug-95
৫	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	উপ-প্রধান প্রকৌশলী	25-May-83
৬	জনাব মোঃ জামালউদ্দিন আহমেদ	ব্যবস্থাপক	6-Mar-88
৭	জনাব মোঃ জুবাইদুল ইসলাম	ঐ	30-Sep-89
৮	জনাব মোঃ আবদুল করিম খান	ঐ	30-Sep-89
৯	জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ	ঐ	28-Feb-88
১০	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	ঐ	30-Mar-92
১১	জনাব নাজিম উদ্দিন	ব্যবস্থাপক (এনগ্রেভিং)	8-Mar-99
১২	জনাব মোঃ এনামুল হক জোয়ারদার	উপ-প্রধান প্রকৌশলী	1-Mar-86
১৩	জনাব সুলতান আহমেদ	ব্যবস্থাপক (ডিজাইনিং)	3-Jul-96
১৪	ডাঃ নাহীদ সুলতানা	উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা	22-Feb-98
১৫	জনাব শেখ আবাদুর রহমান	ব্যবস্থাপক	1-Jul-85
১৬	জনাব কামাল আহমেদ	ঐ	3-Aug-97
১৭	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	ঐ	25-Sep-95
১৮	জনাব মোঃ তওফিকুর রহমান	ঐ	4-Oct-89
১৯	জনাব জহুরুল ইসলাম	ঐ	14-Nov-89
২০	জনাব এস. এম. সানাউলাহ	ঐ	11-May-86
উপ-ব্যবস্থাপক বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম	উপ-ব্যবস্থাপক	12-Jan-85
২	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	নির্বাহী প্রকৌশলী	24-Dec-86
৩	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-ব্যবস্থাপক	6-Mar-88
৪	জনাব মোঃ আজমল হোসেন	ঐ	6-Sep-87
৫	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	ঐ	24-Dec-86
৬	জনাবা শেওফ্‌তা আঞ্জুম আজীজ	ঐ	27-Sep-89

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৭	জনাব মোঃ শামসুজ্জামান	নির্বাহী প্রকৌশলী	20-Jun-96
৮	জনাবা আমিনুল ইসলাম	উপ-ব্যবস্থাপক(গঃওমাঃনিঃ)	7-Jan-07
৯	জনাব আব্দুল মালেক মোল্লা	উপ-ব্যবস্থাপক	31-Oct-89
১০	জনাব খালেদ তাসাররফ	নির্বাহী প্রকৌশলী	30-Jul-08
১১	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	ঐ	1-Feb-83
১২	জনাব মুহম্মদ তোফাজ্জল হোসেন	উপ-ব্যবস্থাপক	7-Nov-89
১৩	জনাব ছৈয়দ আহম্মেদ	ঐ	14-Mar-88
১৪	জনাবা ফাতেমা খাতুন	ঐ	21-Nov-89
১৫	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ভুইয়া	ঐ	25-Jan-88
১৬	জনাব মোঃ হাবিব উল্যাহ তালুকদার	ঐ	6-Jun-87
১৭	জনাব মোঃ রশিদুল আলম খান	ঐ	15-Sep-87
১৮	জনাব মোঃ অহিদুর রহমান	ঐ	27-Feb-88
১৯	জনাব মোঃ ইস্কান্দার জামান	ঐ	27-Apr-85
২০	জনাব শেখ গোলাম মোক্তাদী	ঐ	11-Jun-88
২১	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	নির্বাহী প্রকৌশলী	10-Nov-86
২২	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	উপ-ব্যবস্থাপক	16-Sep-
২৩	জনাব মোঃ আনোয়ার-উল-হুদা	ঐ	29-Dec-84
২৪	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ মোলা	নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর)	1-Jul-83
২৫	জনাব শাহ্‌ মোঃ রইসুল ইসলাম	উপ-ব্যবস্থাপক	7-Mar-88
২৬	জনাব মোঃ ইস্রাফিল	ঐ	5-Mar-88
২৭	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া	ঐ	8-May-88
২৮	জনাব আ,ক,ম ইকবাল হোসেন	ঐ	5-Nov-91
২৯	জনাব মোঃ আব্দুল কাদির	ঐ	21-Sep-87
৩০	জনাব এ,কে,এম রেজাউল করিম	নির্বাহী প্রকৌশলী(যন্ত্রকৌশল)	16-Apr-07
সহঃ ব্যবস্থাপক বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	জনাব এম. এ. করিম খান	কারিগরী কর্মকর্তা	2-Dec-87
২	জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন	ঐ	3-Sep-87
৩	জনাব এ. আর. এম. সোহাইল	ঐ	12-Sep-87
৪	জনাব কাজী মোঃ মোহসীন	ঐ	28-Jun-83
৫	জনাব মোঃ আতাউর রহমান খান	ঐ	19-Nov-89
৬	জনাব মোঃ আফছারুজ্জামান কাছমী	পেশ ইমাম গ্রেড-এ	13-Nov-90
৭	জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম	সহকারী প্রকৌশলী	28-Oct-87
৮	জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান	কারিগরী কর্মকর্তা	28-Jan-88
৯	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	ঐ	6-Mar-89
১০	জনাব এ. কে. এম. সোয়েবুল আলম	ঐ	14-Jan-88
১১	জনাব মোস্তফা সেলিম দুররানী	কারিগরী কর্মকর্তা	24-Feb-87
১২	জনাব মোঃ আশরাফ আলী	নিরাপত্তা কর্মকতা	16-Jan-06
১৩	জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন	ঐ	16-Jan-06
১৪	জনাব মোঃ জাফর আক্তার	সহকারী প্রকৌশলী(যন্ত্রকৌশল)	29-Mar-07
১৫	জনাব মোঃ হাফিজউল্যাহ	সহকারী ব্যবস্থাপক	22-Jun-08
১৬	জনাব মোঃ আবুল বশর মজুমদার	ঐ	29-Feb-88
১৭	জনাব মোঃ তারিক মাহমুদ	চিকিৎসা কর্মকর্তা	14-Oct-09
১৮	জনাব মোঃ আসিম শাহজাদা	সহকারী ব্যবস্থাপক	14-Jan-88
১৯	জনাব সৈয়দ নূরুজ্জামান	ঐ	16-Jan-88
২০	জনাব এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান	ঐ	24-Feb-88
২১	খন্দকার ওবায়দুর রহমান	ঐ	1-Oct-87
২২	জনাব মোঃ শাহ্‌ আলম	ঐ	17-Sep-87
২৩	জনাব এম. এ. মোহাম্মদউলাহ	ঐ	14-Jun-88
২৪	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	কারিগরী কর্মকর্তা	10-Mar-89
২৫	জনাব মোঃ আবুয়াল হোসেন	ঐ	14-Mar-89
২৬	জনাব মোঃ জহিরুল হক	ঐ	7-Sep-87
২৭	জনাব মাহমুদা হাসনাত	কারিগরী কর্মকর্তা	9-Nov-87
২৮	জনাব মোঃ আনোয়ার আলী	ঐ	21-Oct-87

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
২৯	জনাব মোঃ মোজাহারুল হক	সহকারী ব্যবস্থাপক	14-Sep-87
৩০	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	কারিগরী কর্মকর্তা	6-Jul-98
৩১	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	সহকারী ব্যবস্থাপক	17-Jan-88
৩২	জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব	সহকারী ব্যবস্থাপক(আইসি)	20-Jan-88
৩৩	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	সহকারী ব্যবস্থাপক(উনি)	21-Apr-88
৩৪	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	সহকারী ব্যবস্থাপক	8-Sep-91
অফিসার বা সমমানের (কর্মকর্তা)			
১	জনাব মোঃ আবুল বাসার	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	25-Feb-87
২	জনাবা তাহেরা খানম	ঐ	10-Nov-87
৩	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	ঐ	3-Mar-87
৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান জালাল	ঐ	2-Feb-00
৫	জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহিম খান	ঐ	30-May-00
৬	জনাব মোঃ শামসুল হক খান	ঐ	13-Mar-89
৭	জনাব মোঃ মোহাম্মদ আলী	ঐ	19-Mar-89
৮	জনাব মোঃ ওসমান গনি	ঐ	20-Mar-89
৯	জনাব মোঃ মোহাম্মদ আলী-২	ঐ	21-Oct-87
১০	জনাবা মনিরা সুলতানা	ঐ	22-Jul-99
১১	জনাবা শামিমা পারভীন	ঐ	14-Nov-87
১২	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম	অফিসার	29-Jun-88
১৩	জনাব লিটন বড়ুয়া	ঐ	10-Sep-91
১৪	জনাব মোঃ জাহিদ হাসান	ঐ	1-Aug-85
১৫	জনাব মোঃ নবীউলাহ	ঐ	2-Nov-91
১৬	জনাব মোঃ রবিউল আউয়াল	ঐ	5-Mar-88
১৭	জনাব মোহাম্মদ জামাল হেসেন	উপ-সহঃ প্রকৌশলী	16-Mar-08
১৮	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন ভুইয়া	ঐ	17-Jul-08
১৯	জনাব মোঃ আব্দুল বারী	সহঃ নিরাপত্তা কর্মকর্তা	14-Oct-87
২০	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম খন্দকার	ঐ	19-May-87
২১	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	অফিসার	5-Mar-88
২২	জনাব মোঃ আবুল আহসান বিশ্বাস	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	29-May-95
২৩	জনাব ফারুক হাসান মোহাম্মদ মুজাদীর	ঐ	11-Aug-10
২৪	জনাবা আলো রানী সাহা	অফিসার	8-May-88
২৫	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (২)	ঐ	21-Jan-88
২৬	জনাব শেখ মোতাহার হোসেন	ভল্ট অফিসার	23-Jan-88
২৭	জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	3-Jul-91
২৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-১	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	5-Nov-91
২৯	জনাব মোঃ খোরশেদুল আলম মন্ডল	ঐ	16-Oct-94
৩০	জনাব মোঃ হাবিবুল ইসলাম	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(প্রকৌঃ)	24-May-95
৩১	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ঐ	25-Feb-87
৩২	জনাব মোঃ ছাবেদ আলী	ঐ	23-Feb-87
৩৩	জনাব মোঃ মুসলিম খান	ঐ	2-Mar-87
৩৪	জনাব মোঃ আমিন উদ্দিন	ঐ	24-Feb-87
৩৫	জনাব মোঃ মোস্তফা মিয়া	ঐ	1-Mar-83
৩৬	জনাব মোঃ শাহ্জাহান খান	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(উৎপাদন)	2-Sep-87
৩৭	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান পাটোয়ারী	ঐ	2-Sep-87
৩৮	জনাব কাজী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	ঐ	26-Nov-88
৩৯	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	ঐ	16-Mar-89
৪০	জনাব মোঃ মাহ্বুব আল হাসান	সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা	17-May-87
৪১	জনাব মোঃ বনি আমিন আকন	অফিসার	28-Feb-88
৪২	জনাব মোঃ ছাফায়েত হোসেন	ঐ	1-Mar-88
৪৩	জনাব মোঃ খাদেমুল বাসার	ঐ	4-May-88
৪৪	জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ	ঐ	1-Oct-88
৪৫	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর	ঐ	17-Jul-90
৪৬	জনাব মোঃ আব্দুল বারী	ভল্ট অফিসার	20-Jan-88

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৪৭	জনাব শেখ আব্দুল মজিদ	রেমিট্যান্স অফিসার	14-Jan-88
৪৮	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন মোলা	ঐ	20-Jan-88
৪৯	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঐ	23-Jan-88
৫০	জনাব মোঃ আব্দুলাহ্ সেলিম	ভল্ট অফিসার	24-Jan-88
৫১	জনাবা রেবেকা সুলতানা	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(এক্সামিন)	3-Nov-87
৫২	জনাব শাহনাজ পারভীন	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(গওমানি)	3-Oct-04
৫৩	জনাব মোঃ শাহজাহান সিরাজ	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(উৎপাদন)	9-Sep-87
৫৪	জনাব মোঃ মাসুদ করিম	অফিসার	19-Jun-89
৫৫	জনাব পিকলু বড়ুয়া	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা(গওমানি)	13-Sep-99
৫৬	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অফিসার(আইসি)	16-Jan-88
৫৭	জনাব মোঃ শাহ্ খালেদুজ্জামান	ভল্ট অফিসার	16-Jan-88
৫৮	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	7-Mar-87
৫৯	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	ঐ	1-Mar-87
৬০	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	অফিসার	2-Dec-89
৬১	জনাব মোঃ শামীম আল মামুন	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	27-May-87
৬২	জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন	ঐ	8-Dec-88
৬৩	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	টেকনিশিয়ান গ্রেড-এ(প্রিন্টিং)	21-Mar-89
৬৪	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	সহকারী কারিগরী কর্মকর্তা	2-Nov-89
৬৫	জনাব মোঃ রইস উদ্দিন	অফিসার	15/10/2012
৬৬	জনাব মোঃ খালেদ হোসেন	ঐ	11-Jul-12
৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নামের তালিকা (জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক নয়)			
১	জনাব মোঃ বজলুর রহমান	মোয়াজ্জিন	13-Nov-90
২	জনাব মোঃ সেলিম রহমান	মাস্টার টেকনিশিয়ান	12-Apr-88
৩	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট	8-Jun-87
৪	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	ঐ	1-Sep-98
৫	জনাব খান মতিউর রহমান	মাস্টার টেকনিশিয়ান	7-Mar-87
৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	মাস্টার টেকনিশিয়ান(বিদ্যুৎ)	17-May-87
৭	জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ-১	ঐ	17-Oct-87
৮	জনাব সৈয়দ মনিরুল ইসলাম	ঐ	13-Nov-89
৯	জনাব মোঃ কামাল বক্স	ঐ	13-Nov-89
১০	জনাব মোঃ লুৎফুল আলম	ঐ	11-Oct-87
১১	জনাব এম. এ. টি. আজহারুল হক	ঐ	17-Oct-87
১২	জনাব মোঃ বজলুর রশীদ	ঐ	21-Oct-87
১৩	জনাব মোঃ আবু তাহের মোলা	ঐ	24-Oct-88
১৪	জনাব মোঃ মেজবাহ্ উদ্দিন	ঐ	25-Feb-88
১৫	জনাব মোঃ শফিকউজ্জামান	ঐ	1-Mar-87
১৬	জনাব আব্দুল আহাদ	ঐ	21-Oct-87
১৭	জনাব মোঃ শাহ্ আলম খান	ঐ	5-Dec-88
১৮	জনাব মোঃ শরীয়ত উলাহ্	ঐ	29-Feb-88
১৯	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	ঐ	12-Apr-88
২০	জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ-২	ঐ	21-Apr-88
২১	জনাব নূর মোহাম্মাদ বখতিয়ার	ঐ	30-May-89
২২	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	ঐ	11-Mar-87
২৩	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া	ঐ	12-Apr-88
২৪	জনাব শেখ মোঃ শফিকুল ইসলাম	ঐ	12-Nov-89
২৫	জনাব মোঃ সানাউল হক	ঐ	8-Jul-91
২৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঐ	7-Jul-91
২৭	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা মুন্সী	ঐ	8-Dec-88
২৮	জনাব মোঃ মনির হোসেন মিয়া	ঐ	19-Oct-94
২৯	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান	ঐ	16-Oct-94
৩০	জনাবা নাজমা খাতুন	ঐ	23-May-87
৩১	জনাবা গোলাপী খাতুন	ঐ	20-May-87
৩২	জনাবা ফরিদা ইয়াছমিন	সিনিঃ নিরাপত্তা সহকারী গ্রেড-এ	23-May-87

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৩৩	জনাব মোঃ আসলামুল আলম খান	ঐ	24-May-87
৩৪	জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার	ঐ	27-May-87
৩৫	জনাব মোঃ মির্জা গোলাম কিবরিয়া	ঐ	11-Oct-87
৩৬	জনাব মোঃ শাহ্জাহান আলী	ঐ	28-Jan-89
৩৭	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	ঐ	4-Feb-89
৩৮	জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ	ঐ	4-Feb-89
৩৯	জনাব মোঃ ছায়েদুর রহমান	ঐ	6-Feb-89
৪০	জনাব মোঃ শাহ্জাহান মিয়া	ঐ	3-Aug-89
৪১	জনাব মোঃ মোসলেম	ঐ	8-Jul-99
৪২	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	ঐ	19-Aug-99
৪৩	জনাব মোঃ মাহ্বুব খান	ঐ	9-Jun-87
৪৪	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান	উদ্ধতন নিরাঃ সহঃ গ্রে-বি	9-Jun-87
৪৫	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	ঐ	10-Jun-87
৪৬	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর ভুইয়া	ঐ	11-Oct-87
৪৭	জনাব মোঃ সামছুল হক	নিরাপত্তা সহকারী	10-Jun-09
৪৮	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান	উর্দ্ধতন ভল্ট সহঃ গ্রে-এ	20-May-87
৪৯	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম - ৪	ঐ	10-Jul-88
৫০	জনাব এস. এম. জাকারিয়া হোসেন	ঐ	25-Jan-88
৫১	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	উর্দ্ধতন সহকারী গেড্-এ	19-Oct-83
৫২	জনাব মোঃ শহীদ উলাহ	ঐ	5-Jan-85
৫৩	জনাবা ইসমত আরা খাতুন	ঐ	30-Aug-91
৫৪	জনাবা অর্পনা রানী মোহন্ত	ঐ	3-Nov-91
৫৫	জনাব মোঃ আবুল বাসার গাজী	ঐ	30-Jan-92
৫৬	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	ঐ	26-Jun-88
৫৭	জনাবা লেলিনা আকতার	ঐ	23-Dec-91
৫৮	জনাব মোঃ ফজলুল হক	ঐ	16-Mar-95
৫৯	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	ঐ	28-Mar-95
৬০	জনাব শাহ্জাহান বেপারী	ঐ	26-Jun-95
৬১	জনাব মোঃ আবু সৈয়দ	ঐ	14-Jun-95
৬২	জনাব সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন	ঐ	20-Sep-95
৬৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঐ	14-Nov-95
৬৪	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার	ঐ	14-Jun-95
৬৫	জনাব মোঃ নূরুল আলম	ঐ	6-Jun-96
৬৬	জনাব মোঃ খোরশেদ আলী	ঐ	6-Aug-97
৬৭	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ	24-Jul-97
৬৮	জনাব মোঃ শাহ্ আলম	উর্দ্ধতন সহকারী গেড্-এ	27-Jul-97
৬৯	জনাব শাহ মোঃ ইউনুস আলী	ঐ	18-Mar-98
৭০	জনাব শহীদ আজাদ আবিদ	ঐ	12-May-98
৭১	জনাব মোঃ শহীদুলাহ	ঐ	12-May-98
৭২	জনাব ফিকরুল হায়দার	ঐ	23-Jul-98
৭৩	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুনুর রশিদ	ঐ	14-Mar-99
৭৪	জনাব মোঃ জলিলুর রহমান	ঐ	22-Mar-99
৭৫	জনাব নাজনীন আলম	ঐ	23-Jun-99
৭৬	জনাব মোঃ শামছুল বারী	ঐ	19-Jun-86
৭৭	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর মজুমদার	ঐ	1-Apr-01
৭৮	জনাব মুহাম্মদ শরীফ আল মামুন	ঐ	7-Jun-01
৭৯	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা	সহকারী	1-Apr-01
৮০	জনাবা সালেহা খাতুন	উর্দ্ধতন পরীক্ষক গ্রেড-এ	3-Nov-87
৮১	জনাবা মনোয়ারা ইয়াসমিন	ঐ	3-Nov-87
৮২	জনাবা হাসিনা আক্তার	ঐ	3-Nov-87
৮৩	জনাবা আকিকুন নাহার	ঐ	3-Nov-87
৮৪	জনাবা কাজী আছমা বেগম	ঐ	3-Nov-87
৮৫	জনাবা শাহ্নাজ সুলতানা	ঐ	3-Nov-87
৮৬	জনাবা আছিয়া খাতুন	ঐ	9-Nov-87
৮৭	জনাবা ফাতেমা খাতুন	ঐ	9-Nov-87
৮৮	জনাবা নূরজাহান বেগম	ঐ	9-Nov-87
৮৯	জনাবা নাছিমা খাতুন (১)	ঐ	9-Nov-87
৯০	জনাবা শামসুন্নাহার (২)	ঐ	9-Nov-87
৯১	জনাবা তৈয়বা খাতুন	ঐ	9-Nov-87
৯২	জনাবা সুফিয়া আকতার	ঐ	9-Nov-87
৯৩	জনাবা নাছিমা আক্তার	ঐ	14-Nov-87
৯৪	জনাবা পিয়ারা বেগম	ঐ	10-Nov-87
৯৫	জনাবা দেলোয়ারা বেগম-১	ঐ	10-Nov-87
৯৬	জনাবা মিনারা আকতার	ঐ	10-Nov-87
৯৭	জনাবা হাচিনা বেগম	ঐ	10-Nov-87
৯৮	জনাবা মাহমুদা বেগম	ঐ	10-Nov-87
৯৯	জনাবা শাহনাজ বেগম	ঐ	12-Nov-87
১০০	জনাবা রাশিদুন নাহার	ঐ	14-Nov-87
১০১	জনাবা ছিদ্দিকুন নাহার	ঐ	14-Nov-87
১০২	জনাবা সাঈদা আকতার	ঐ	14-Nov-87
১০৩	জনাবা দেলোয়ারা বেগম (২)	ঐ	15-Nov-87
১০৪	জনাবা খোদেজা খাতুন	উর্দ্ধতন পরীক্ষক গ্রেড-এ	15-Nov-87
১০৫	জনাবা জোহরা আক্তার	ঐ	15-Nov-87
১০৬	জনাবা নাজমে আরা	ঐ	17-Nov-87
১০৭	জনাবা শামীম আরা	ঐ	18-Nov-87
১০৮	জনাবা শাহীনা আক্তার বানু	ঐ	18-Nov-87
১০৯	জনাবা মমতাজ আক্তার	ঐ	19-Nov-87
১১০	জনাবা জাহিদা বেগম	ঐ	19-Nov-87
১১১	জনাবা নাদিরা বেগম	ঐ	19-Nov-87
১১২	জনাবা খন্দকার নাসরীন আকতার	ঐ	22-Nov-87
১১৩	জনাবা দিলারা শাহীন	ঐ	25-Nov-87
১১৪	জনাবা শাহনাজ আরা	ঐ	3-Jan-88
১১৫	জনাবা ফৌজিয়া আল জিনাত	ঐ	7-Jan-88
১১৬	জনাবা ইয়াসমীন সুলতানা	ঐ	11-Jan-88
১১৭	জনাবা জুবাইদা পারভীন	ঐ	30-Jan-88
১১৮	জনাবা মরিয়ম বেগম	ঐ	2-Feb-88
১১৯	জনাবা মোরশেদা বেগম	ঐ	3-Feb-88
১২০	জনাবা নিগার সুলতানা	ঐ	3-Feb-88
১২১	জনাবা ইসমত আরা	ঐ	10-Feb-88
১২২	জনাবা মঞ্জুয়ারা বেগম	ঐ	21-Mar-88
১২৩	জনাবা নাহিদা বেগম	ঐ	22-Mar-88
১২৪	জনাবা সেরাতুন নাহার	ঐ	24-Mar-88
১২৫	জনাবা নার্গিস আক্তার	ঐ	24-Mar-88
১২৬	জনাবা সেলিনা খাতুন	ঐ	27-Mar-88
১২৭	জনাবা তাসলিমা পারভীন	ঐ	28-Mar-88
১২৮	জনাবা নাজমুন নাহার	ঐ	29-Mar-88
১২৯	জনাবা রিগান আক্তার চৌধুরী	ঐ	29-Mar-88
১৩০	জনাবা নাসরীন সুলতানা	ঐ	30-Mar-88
১৩১	জনাবা আছমা বেগম	ঐ	30-Mar-88
১৩২	জনাবা সালমা বেগম	ঐ	30-Mar-88
১৩৩	জনাবা ফারহানা কাওসার	ঐ	31-Mar-88
১৩৪	জনাবা কে. এম. তাসলিমা হেলেন	ঐ	31-Mar-88
১৩৫	জনাবা আফরোজা বেগম	ঐ	22-Mar-88
১৩৬	জনাবা নাছিমা খাতুন (২)	ঐ	2-Apr-88
১৩৭	জনাবা মোমেনা খাতুন	ঐ	26-Apr-88
১৩৮	জনাবা ফারহানা শামীম	ঐ	30-May-88
১৩৯	জনাবা কেশোয়ারা সুলতানা	ঐ	27-Mar-88
১৪০	জনাব ফেরদৌসী বেগম (১)	উর্ধ্বতন পরীক্ষক গ্রেড-এ	10-Jan-88

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
১৪১	জনাব শামসুন্নাহার (১)	ঐ	3-Nov-87
১৪২	জনাবা জান্নাতুল ফেরদৌস আরা বেগম	ঐ	4-Sep-90
১৪৩	জনাবা নারগিস সুলতানা	ঐ	29-Aug-91
১৪৪	জনাবা রৌশনা পারভীন	ঐ	29-Aug-91
১৪৫	জনাবা রেজিনা বেগম	ঐ	4-Sep-91
১৪৬	জনাবা জোতির্ময়ী দাস	ঐ	12-Sep-91
১৪৭	জনাবা সৈয়দা ওয়াহিদা রহমান	ঐ	24-Oct-91
১৪৮	জনাবা রোজিনা আখতার	ঐ	1-Jun-95
১৪৯	জনাবা সালমা আক্তার	ঐ	30-May-95
১৫০	জনাবা রেহানা আক্তার	ঐ	29-May-95
১৫১	জনাবা আয়শা আক্তার	ঐ	28-May-95
১৫২	জনাবা কানিজ ফাতেমা	ঐ	1-Feb-88
১৫৩	জনাবা নারগিস আক্তার	ঐ	2-Nov-89
১৫৪	জনাবা আলেয়া খাতুন	ঐ	2-May-99
১৫৫	জনাবা হাবিবা আফরোজ	ঐ	2-Jul-00
১৫৬	জনাবা শেফালী খানম	ঐ	3-Jul-00
১৫৭	জনাবা আম্বিয়া খাতুন	ঐ	3-Jul-00
১৫৮	জনাব মোসাম্মৎ কুলসুম বেগম	ঐ	24-Jul-00
১৫৯	জনাব সোমেন চৌধুরী	ঐ	1-Apr-01
১৬০	জনাব মোঃ আল মামুন	ঐ	1-Apr-01
১৬১	জনাব জন ক্রিশ্চিয়ান	ঐ	1-Apr-01
১৬২	জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন মলিক	ঐ	1-Apr-01
১৬৩	জনাব মোঃ মাসুদুল হক	ঐ	1-Apr-01
১৬৪	জনাব মোঃ এহছানুল হক	ঐ	1-Apr-01
১৬৫	জনাবা মঞ্জুয়ারা খানম	ঐ	1-Apr-01
১৬৬	জনাব গাজী মিজানুর রহমান	ঐ	7-Jun-01
১৬৭	জনাব অশেষ বিশ্বাস	ঐ	8-May-04
১৬৮	জনাব রাজিব হাসান তালুকদার	ঐ	9-May-04
১৬৯	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	ঐ	14-Jul-04
১৭০	জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম	ঐ	25-Sep-04
১৭১	জনাবা হামিদা আক্তার	ঐ	19-Apr-88
১৭২	জনাব মোহাম্মদ হিরন কামাল	উর্ধ্বতন পরীক্ষক গ্রেড-বি	28-Mar-07
১৭৩	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	ঐ	9-May-07
১৭৪	জনাবা পেয়েরা খাতুন	ঐ	1-Dec-98
১৭৫	জনাবা নাসিমা খাতুন	ঐ	6-Dec-98
১৭৬	জনাব মোঃ দেলসাদ আলী	উর্ধতন পিসি গ্রেড-এ	27-Jan-88
১৭৭	জনাব মোঃ রইচ উদ্দিন	ঐ	2-Jun-88
১৭৮	জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার	ঐ	10-Nov-91
১৭৯	জনাব মোঃ আমিনুল হক শাহ্	ঐ	22-Dec-91
১৮০	জনাব এ. কে. এম. জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	22-Oct-91
১৮১	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন	ঐ	23-Jul-92
১৮২	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন তালুকদার	ঐ	18-Sep-95
১৮৩	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ঐ	29-Aug-95
১৮৪	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	ঐ	14-Jul-97
১৮৫	জনাব মোঃ শাহ্ এমরান	ঐ	15-Jul-97
১৮৬	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ	16-Jul-97
১৮৭	জনাব আবদুল মোমেন	ঐ	20-Oct-98
১৮৮	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ঐ	22-Mar-99
১৮৯	জনাব মোঃ শায়েস্তা সরোয়ার খান	ঐ	18-Apr-88
১৯০	জনাব গাজী মোঃ রইসুল ইসলাম	ঐ	11-Jul-99
১৯১	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	ঐ	5-Jan-85
১৯২	জনাব মোঃ আকতার উজ্জামান	উর্ধ্বতন আই.সি গ্রেড-এ	27-Apr-88
১৯৩	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	ঐ	12-Jul-88
১৯৪	জনাব এফ. এম. মোরাদ হোসেন	ঐ	12-Feb-89

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
১৯৫	জনাব মোঃ শাহ্জাহান	ঐ	13-Feb-89
১৯৬	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	ঐ	9-Nov-91
১৯৭	জনাব মোঃ সিকদার মাহবুব সাদাত	ঐ	11-Jul-92
১৯৮	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ঐ	25-Jul-92
১৯৯	জনাব মোঃ নুরুল হক	ঐ	17-Jun-95
২০০	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ	25-Feb-96
২০১	জনাব মোঃ শওকত আলী	ঐ	20-Aug-96
২০২	জনাব মোঃ ঈশা রুহুল্যা	ঐ	24-Aug-96
২০৩	জনাব মোঃ জালাল হোসেন রাজু	ঐ	13-Feb-96
২০৪	জনাব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ	ঐ	12-May-98
২০৫	জনাব মনছুর আলম	ঐ	17-May-98
২০৬	জনাব মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার	উর্ধ্বতন আই.সি গ্রেড-এ	19-May-98
২০৭	জনাব কাজী জসিম উদ্দিন	ঐ	10-Jun-98
২০৮	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন মৃধা	ঐ	4-Jul-99
২০৯	জনাব মোঃ আরিফুল আলম খাঁন	ঐ	14/06/2000
২১০	জনাব শামীম আহমেদ	ঐ	18/06/2000
২১১	জনাব মোঃ শাহরিয়ার মুরাদ	ঐ	1-Apr-01
২১২	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান	আইসি	1-Apr-01
২১৩	জনাব মোঃ রেজাউল করিম-১	ঐ	7-Apr-88
২১৪	জনাব মোঃ আবুল বাশার খান	ঐ	4-Oct-87
২১৫	জনাব মোঃ শামছুজ্জামান	ঐ	31-Jul-04
২১৬	জনাবা শামীম আরা বেগম	টেলিফোন অপারেটর গ্রেড-এ	5-Mar-91
২১৭	জনাবা জেসমিন আকতার	ঐ	14-Mar-91
২১৮	জনাব মোঃ ইলিয়াছুজ্জামান	মাস্টার টেকনিশিয়ান(এসি)	2-Sep-87
২১৯	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান(এসবিও)	27-Oct-87
২২০	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	মাস্টার টেকনিশিয়ান(গওমানি)	15-Oct-87
২২১	জনাব বীরেন্দ কুমার সিংহ	মাস্টার টেকনিশিয়ান(এসি)	11-Mar-95
২২২	জনাব মোঃ রেজাউল করিম (২)	মাস্টার টেকনিশিয়ান(মেকাঃ)	24-Dec-89
২২৩	জনাব সৈয়দ মুরাদ হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান (ইলিট্রিক্যাল)	12-Aug-96
২২৪	জনাব মোঃ নূরুন্নবী মিয়া	ঐ	18-Sep-96
২২৫	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান	1-Oct-87
২২৬	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	ঐ	6-Oct-87
২২৭	জনাব মোঃ আঃ খালেক	ঐ	22-May-89
২২৮	জনাব মোঃ পান্নু মিয়া	মাস্টার টেকনিশিয়ান(উনি)	23-May-89
২২৯	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	মাস্টার টেকনিশিয়ান	19-Mar-85
২৩০	জনাব মোঃ সিরাজ উল্যাহ	ঐ	30-Mar-87
২৩১	জনাব মোঃ আনছার উদ্দিন	ঐ	31-Mar-87
২৩২	জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন	ঐ	4-Apr-87
২৩৩	জনাব মোঃ জুলহাস উদ্দিন	ঐ	30-Mar-87
২৩৪	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান	3-Mar-89
২৩৫	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন	মাস্টার টেকনিশিয়ান(এসবিও)	6-Apr-00
২৩৬	জনাব মোঃ কহিনুর মিয়া	সিনিয়র টেকনিশিয়ান(পাম্প)	19-Apr-88
২৩৭	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ	ঐ	21-Apr-88
২৩৮	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মাস্টার টেকনিশিয়ান (ইলিট্রিক্যাল)	5-Dec-88
২৩৯	জনাব এ. কে. এম. সহিদুর রহমান	ঐ	25-May-87
২৪০	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহাম্মদ	মাস্টার টেকনিশিয়ান (অটো)	10-Oct-87
২৪১	জনাব মোঃ সামসুল আলম খান	মাস্টার টেকনিশিয়ান (ইলিট্রিক্যাল)	19-Apr-88
২৪২	জনাব মোঃ আবু মুসলিম	মাস্টার টেকনিশিয়ান (ইলিট্রিক্যাল)	11-Oct-87
২৪৩	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	মাস্টার টেকনিশিয়ান (ইলিট্রিক্যাল)	18-Apr-88
২৪৪	জনাব মোঃ আমির হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান (কার্পেন্টার)	1-Aug-93
২৪৫	জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম	সুপারভাইজার	3-Jun-86
২৪৬	জনাব মোঃ রশিদুল ইসলাম (উল্কা)	সহকারী সুপারভাইজর	25-Mar-87
২৪৭	জনাব মোঃ শওকত হোসেন	ঐ	25-Mar-87
২৪৮	জনাব মোঃ শাহ্জাহান	গাড়ীচালক গ্রে-এ	28-Mar-87

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
২৪৯	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন মোলা	ফর্ক লিফ্ট অপারেটর গ্রে-এ	18-Apr-88
২৫০	জনাব মোঃ আইয়ুব খান	গাড়ীচালক গ্রে-এ	3-Dec-95
২৫১	জনাব মোঃ ফজলুল হক	ফর্ক লিফ্ট অপারেটর গ্রে-এ	18-Apr-88
২৫২	জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ	ফর্ক লিফ্ট অপারেটর গ্রে-বি	13-Nov-89
২৫৩	জনাব মোঃ আব্দুর রব	ঐ	14-Nov-89
২৫৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	গাড়ীচালক গ্রেড-বি	9-Jan-06
২৫৫	জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	ঐ	9-Jan-06
২৫৬	জনাব মীর হাবিবুর রহমান	ঐ	9-Jan-06
২৫৭	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী	মাস্টার টেকনিশিয়ান মেকাঃ)	10-Apr-88
২৫৮	জনাব মোঃ নাজমুল হক খান	মাস্টার টেকনিশিয়ান(প্রিন্টিং)	5-Jun-95
২৫৯	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	ঐ	20-Aug-96
২৬০	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-২	ঐ	1-Sep-96
২৬১	জনাব সৈয়দ শফিকুল ইসলাম	ঐ	7-Sep-96
২৬২	জনাব সফিকুল ইসলাম	ঐ	22-Mar-98
২৬৩	জনাব জ্ঞান প্রসাদ চাকমা	ঐ	3-Jun-98
২৬৪	জনাব শেখ আব্দুল জলিল	ঐ	29-Nov-98
২৬৫	জনাব মোঃ নুরুল হক মিয়া	ঐ	25-Jan-99
২৬৬	জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান খান	ঐ	2-Feb-99
২৬৭	জনাব মোঃ ফিরোজ	টেকনিশিয়ান	7-Feb-99
২৬৮	জনাব মোঃ সোয়েল রানা	ঐ	27-Jul-99
২৬৯	জনাব অপু বিকাশ বড়ুয়া	ঐ	8-Aug-99
২৭০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	ঐ	28-Nov-99
২৭১	জনাব মোঃ একরামুল হোসেন	ঐ	23-Dec-03
২৭২	জনাব সারোয়ারে আলম সরকার	ঐ	9-May-04
২৭৩	জনাব মোঃ শাকিরুল ইসলাম	টেকনিশিয়ান	1-Jun-89
২৭৪	জনাব কাজী মোহাম্মদুল হক	মাস্টার টেকনিশিয়ান	15-Apr-88
২৭৫	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সেক	ঐ	16-Apr-88
২৭৬	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	ঐ	16/07/2000
২৭৭	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	ঐ	12-Oct-87
২৭৮	জনাব মোঃ মিয়াজ উদ্দিন	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	5-Jan-85
২৭৯	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	মাস্টার টেকনিশিয়ান	5-Jan-85
২৮০	জনাব মোঃ আলী আকবর	ঐ	5-Jan-85
২৮১	জনাব মোঃ আবু সাঈদ মিয়া	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	5-Jan-85
২৮২	জনাব মোঃ ইদ্রিস ভুইয়া	মাস্টার টেকনিশিয়ান	18-Mar-85
২৮৩	জনাব মোঃ রবিউল হোসেন	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	25-Mar-85
২৮৪	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	10-Dec-86
২৮৫	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	ঐ	26-Jan-88
২৮৬	জনাব সৈয়দ আজিজুর রহমান	ঐ	4-Jan-89
২৮৭	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন	ঐ	6-Mar-89
২৮৮	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	ঐ	19-Mar-85
২৮৯	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (২)	ঐ	23-May-89
২৯০	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	ঐ	19-Jun-89
২৯১	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আঁকন	ঐ	21-Jun-89
২৯২	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	মাস্টার টেকনিশিয়ান	18/04/2000
২৯৩	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	ঐ	28/05/2000
২৯৪	জনাব খঃ জয়নাল আবেদীন	সিনিয়র ল্যাবঃ এ্যাসিস্ট্যান্ট	1-Sep-04
২৯৫	জনাব মোঃ তোতা মিয়া	মাস্টার টেকনিশিয়ান	10-Apr-88
২৯৬	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	5-Jan-85
২৯৭	জনাব মোঃ আব্দুল হক	মাস্টার টেকনিশিয়ান	17-Oct-83
২৯৮	জনাব মাইকেল দিলিপ বাড়ৈ	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	28/12/89
২৯৯	জনাব মোহাম্মদ বদরুল আলম	ঐ	1-Feb-06
৩০০	জনাব আলমগীর হোসেন	ঐ	30-Jan-06
৩০১	জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান খাঁন	ঐ	1-Feb-06
৩০২	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ঐ	28-Jul-97
৩০৩	জনাব মোঃ ইদ্রিস সিকদার	ঐ	14-May-06
৩০৪	জনাব আবু শোয়েব নূর আহম্মদ	মাস্টার টেকনিশিয়ান	6-Sep-07
৩০৫	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	3-Dec-88
৩০৬	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ	সহকারী	2-Jul-09

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৩০৭	জনাব মোঃ আবুল বাশার	ঐ	17-Jun-09
৩০৮	জনাব হিমা খাতুন	ঐ	17-Jun-09
৩০৯	জনাব শামসুন নাহার	ঐ	21-Jun-09
৩১০	জনাব মোঃ রবিউল আলম	পিসি	28-Jun-09
৩১১	জনাব মোঃ ফিরোজ আলম	ঐ	21-Jan-10
৩১২	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দীক	টেকনিশিয়ান	16-Feb-10
৩১৩	জনাব মোঃ মাসুদ রানা উজ্জ্বল	আইসি	14-Jun-10
৩১৪	জনাব মোঃ তৌফিকুর রহমান	পিসি	11-Aug-10
৩১৫	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম	ঐ	11-Aug-10
৩১৬	জনাব হাওলাদার আসাদুজ্জামান	পরীক্ষক	10/8/3/8/10
৩১৭	জনাব কামাল উদ্দিন শেখ	টেকনিশিয়ান	13-Jun-10
৩১৮	জনাব নাহিদ হাসান	ঐ	13-Jun-10
৩১৯	জনাব আরিফ হোসাইন	ঐ	14-Jun-10
৩২০	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	টেকনিশিয়ান	30-Aug-10
৩২১	জনাব সোহেল হোসেন	ঐ	10-Aug-10
৩২২	জনাব মোঃ আকবর আলী	ঐ	26-Aug-10
৩২৩	জনাব মোঃ ফিরুজ মিয়া	ঐ	19-Apr-88
৩২৪	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	ফর্ক লিফ্ট অপারেটর	11-Mar-88
৩২৫	জনাব মোঃ কালিমুলাহ্	টেকনিশিয়ান	3-Jan-89
৩২৬	জনাব মোঃ সেলিম মাহমুদ	ঐ	3-Nov-91
৩২৭	জনাব মোঃ রেজাউল করিম (৩)	ঐ	3-Nov-91
৩২৮	মিসেস নাজমা খাতুন	নিরাপত্তা সহকারী	21-Dec-10
৩২৯	জনাব আমিরুজ্জামান	ঐ	24-Dec-10
৩৩০	জনাব মোঃ খায়রুল আলম	ঐ	23-Dec-10
৩৩১	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	ঐ	20-Dec-10
৩৩২	জনাব মাহবুব আলম	ঐ	26-Dec-10
৩৩৩	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের	টেকনিশিয়ান	25-Nov-10
৩৩৪	জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	আইসি	22-Dec-10
৩৩৫	জনাব কাওছার	ঐ	20-Dec-10
৩৩৬	কুমারী সীমা বড়ুয়া	সহকারী	21-Jan-11
৩৩৭	জনাব মোঃ মনজুরুল আলম	টেকনিশিয়ান(এসিঅপাঃ)	
৩৩৮	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন	কেয়ারটেকার গ্রেড-বি	15-May-84
৩৩৯	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান মোল্লা	ঐ	1-Mar-88
৩৪০	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন	ঐ	5-Jan-85
৩৪১	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ	ঐ	23-Mar-85
৩৪২	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	ঐ	5-Oct-87
৩৪৩	জনাব মোঃ আবু সাঈদ মিয়া	ঐ	7-Oct-87
৩৪৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঐ	28-Mar-85
৩৪৫	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন	টেকনিশিয়ান	21-Jul-92
৩৪৬	জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন	ঐ	2-May-95
৩৪৭	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঐ	8-Jul-97
৩৪৮	আছমা সুলতানা	পরীক্ষক	10-Feb-11
৩৪৯	সালভিয়া আক্তার	ঐ	23-Feb-11
৩৫০	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	ঐ	24-Feb-11
৩৫১	জনাব মোঃ শাহরিয়া-আল-ইজাজ	পিসি	13-Mar-11
৩৫২	জনাব মোঃ রুহুল আজিজ	ঐ	14-Mar-11
৩৫৩	জনাব মুরশালিন	ঐ	21-Mar-11
৩৫৪	জনাব ইলিয়াছ	সহকারী	8-Jul-97
৩৫৫	মিসেস সাহিদা আক্তার	পরীক্ষক	29-Mar-11
৩৫৬	জনাব জাহেদুল ইসলাম	সহকারী	4-Apr-11
৩৫৭	মিসেস তাহেরা খাতুন	পরীক্ষক	10-Apr-11
৩৫৮	জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম	আইসি	7-Aug-11
৩৫৯	জনাব রিপন চাকমা	মাস্টার টেকনিশিয়ান	6-Sep-11
৩৬০	,, মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ	6-Sep-11
৩৬১	,, শেখ মোঃ সুমন	ঐ	6-Sep-11
৩৬২	,, মোঃ আফজাল হোসেন	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	6-Sep-11
৩৬৩	,, মোঃ রাসেল	ঐ	6-Sep-11
৩৬৪	,, নির্মল বিকাশ চাকমা	ঐ	6-Sep-11

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৩৬৫	,, মোঃ নুরুজ্জামান	পিসি	6-Sep-11
৩৬৬	,, মোঃ আশরাফ হোসেন	ঐ	6-Sep-11
৩৬৭	,, মোঃ মাহবুবুর রহমান	ঐ	6-Sep-11
৩৬৮	,, মোঃ মাহমুদুল ইসলাম	আইসি	6-Sep-11
৩৬৯	,, অনিমেষ কুমার সরকার	ঐ	6-Sep-11
৩৭০	,, কে এইচ গোলাম রাব্বানী	ঐ	6-Sep-11
৩৭১	,, মোঃ কামাল উদ্দিন	ঐ	6-Sep-11
৩৭২	,, বাহাউদ্দিন আহমেদ	পরীক্ষক	6-Sep-11
৩৭৩	,, শরীফুল ইসলাম	ঐ	6-Sep-11
৩৭৪	মোছাঃ রীনা পারভীন	ঐ	6-Sep-11
৩৭৫	মিসেস আছমা খানম	ঐ	6-Sep-11
৩৭৬	জনাব আশরাফুল ইসলাম	ঐ	6-Sep-11
৩৭৭	,, মুহাম্মদ আলী আকবর	ঐ	6-Sep-11
৩৭৮	,, মোঃ আতিকুর রহমান	ঐ	6-Sep-11
৩৭৯	,, মোঃ হারুনর রশীদ	টেকনিশিয়ান	6-Sep-11
৩৮০	,, মোঃ ফরহাদ আলী	ঐ	6-Sep-11
৩৮১	,, মোঃ আবুল হোসেন	টেকনিশিয়ান(এসি)	28-Nov-11
৩৮২	,, ফারহানা নোমান	মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট	13-May-12
৩৮৩	,, মোঃ সাদিক আল বাকী	ঐ	7-Jun-12
৩৮৪	,, মোহাম্মদ ইয়াছিন	পরীক্ষক	28-Nov-12
৩৮৫	,, উম্মে সালমা	ঐ	14/10/12
৩৮৬	,, মোঃ মাসুদ রানা	ঐ	14/10/12
৩৮৭	,, মোঃ কামাল হোসেন	ঐ	17/10/12
৩৮৮	,, সাবেরিন নাহার	ঐ	10-Nov-12
৩৮৯	,, রাশেদা আক্তার	ঐ	14-Oct-12
৩৯০	,, নাহিদা সুলতানা	ঐ	11-Oct-12
৩৯১	,, কামরুন নাহার	পরীক্ষক	11-Oct-12
৩৯২	,, রাতুল বড়ুয়া	ঐ	1-Nov-12
৩৯৩	,, ফারহানা ইয়াসমিন	ঐ	15-Oct-12
৩৯৪	,, মোঃ শওকত হোসেন	ঐ	14-Oct-12
৩৯৫	,, মোঃ কাওছার হোসেন	ঐ	18-Oct-12
৩৯৬	,, মোঃ এমরান হোসেন	ঐ	1-Nov-12
৩৯৭	,, মোঃ নাজিম উদ্দিন	ঐ	18-Oct-12
৩৯৮	,, মোঃ আল আমিন	ঐ	18-Oct-12
৩৯৯	,, মোঃ ফেরদৌস ইসলাম	ঐ	26-Nov-12
৪০০	,, মোঃ রাকিব হোসেন খান	ঐ	14-Oct-12
৪০১	,, ফারহা তাসনুভা অর্পিতা	ঐ	29-Nov-12
৪০২	,, তানিয়া আক্তার	সহকারী	16-Oct-12
৪০৩	,, আয়েশা নজরুল চৌধুরী	ঐ	11-Nov-12
৪০৪	,, নুরুন নাহার আফরিন স্মৃতি	ঐ	16-Oct-12
৪০৫	,, মোঃ খালেকুজ্জামান	ঐ	11-Oct-12
৪০৬	,, মোঃ জাকির হোসেন	ঐ	18-Oct-12
৪০৭	,, মোঃ এনায়েত ফাতেমা	ঐ	14-Oct-12
৪০৮	,, সজীব দাস	পিসি/আইসি/ভঃসঃ	14-Oct-12
৪০৯	,, মোঃ রাসেল মিয়া	ঐ	15-Oct-12
৪১০	,, মোঃ সাইদুর রহমান	ঐ	2-Dec-12
৪১১	,, জিএম মোহাম্মাদ আলী	ঐ	2-Nov-12
৪১২	,, হোসাইন মাহমুদ	ঐ	27-Nov-12
৪১৩	,, মোঃ আহসান হাবিব	ঐ	14-Oct-12
৪১৪	,, মোঃ হাসিবুল হোসেন	ঐ	14-Oct-12
৪১৫	,, মোঃ তারিফ হোসেন	নিরাপত্তা সহকারী	17-Jun-12
৪১৬	,, মোঃ মহব্বত হোসেন	ঐ	16-Oct-12
৪১৭	,, মোঃ ইলিয়াস ইফতেখার	ঐ	14-Oct-12
৪১৮	,, মোঃ জিলুর রহমান	টেকনিশিয়ান(উৎ)	14-Oct-12
৪১৯	,, মোঃ মাহবুবুর রহমান	ঐ	14-Oct-12
৪২০	,, মোঃ রজ্জব আলী	ঐ	16-Oct-12
৪২১	,, মাহফুজুর রহমান	টেকনিশিয়ান(ইলেকঃ)	16-Oct-12
৪২২	,, নরেশ চন্দ্র রায়	টেকনিশিয়ান(মেকানিক্যাল)	4-Nov-12
৪২৩	,, জনার্দন দেব শর্মা	টেকনিশিয়ান(মেকানিক্যাল)	21-Oct-12
৪২৪	,, মোঃ তানভীর ইসলাম	টেকনিশিয়ান(উইটিলিটি)	11-Nov-12
৪২৫	,, মোঃ মুনজুরুল ইসলাম	টেকনিশিয়ান(গঃ ও মানি)	7-Nov-12

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নামের তালিকা (জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক নয়)

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	জনাবা আবেদা বেগম	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(পিয়ন)	18-Jul-85
২	জনাব বাবু জয়রাম	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(মালি)	1-Oct-85
৩	জনাব মোঃ ইমাম হোসেন চৌধুরী	নিরাপত্তা পহরী গ্রেড-এ	16-Mar-85
৪	জনাব মোঃ সোলায়মান আলী	ঐ	31-Mar-85
৫	জনাব মোঃ আকতার হোসেন	ঐ	31-Mar-85
৬	জনাব মোঃ মন্টু মিয়া	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(মালি)	9-Dec-86
৭	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(সার্তি বয়)	2-Apr-87
৮	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন আকন	ঐ	7-Mar-88
৯	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর	পাঁচক গ্রেড-এ	18-Jul-85
১০	জনাব মোঃ শুকুর আলী	ঐ	31-Mar-87
১১	জনাব মোঃ আবুল কালাম	ঐ	6-May-87
১২	জনাব মোঃ তাজরুল ইসলাম	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(ক্লিনার)	25-Oct-89
১৩	শ্রী নিবাস চন্দ্র সরকার	ঐ	25-Oct-89
১৪	জনাব মোঃ সিদ্দিক আলী	ঐ	28-Oct-89
১৫	জনাব মোঃ গেনু মিয়া	ঐ	28-Oct-89
১৬	জনাব মোঃ মোহাম্মদ আলী	ঐ	29-Oct-89
১৭	জনাব মোঃ আলাল উদ্দিন হাওলাদার	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(পিয়ন)	30-Oct-89
১৮	জনাব মোঃ সিরাজ	ঐ	4-Nov-89
১৯	জনাব এস. এম. কামাল উদ্দিন	ঐ	12-Nov-89
২০	জনাব মোঃ জাকির হোসেন ঠাকুর	ঐ	3-Nov-91
২১	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন	ঐ	3-Nov-91
২২	জনাব শুকেন চন্দ্র বর্মন	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(ক্লিনার)	3-Nov-91
২৩	জনাব মোঃ সাদেন খাঁ	ঐ	3-Nov-91
২৪	জনাব মোঃ সেলিম গাজী	ঐ	3-Nov-91
২৫	জনাব মোঃ সুরুজ্জামান	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(পিয়ন)	3-Nov-91
২৬	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মোলা	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(ক্লিনার)	4-Nov-91
২৭	জনাব আবুল কালাম	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(বাস হেলপার)	4-Nov-91
২৮	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(ক্লিনার)	5-Nov-91
২৯	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন প্রধান	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(মালি)	16-Mar-95
৩০	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক খান	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(পিয়ন)	2-Oct-96
৩১	জনাব মোঃ জোনাব আলী	ঐ	2-Oct-96
৩২	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঐ	3-Oct-96
৩৩	জনাব মোঃ এস. এম. মেহেদী	ঐ	9-Jul-97
৩৪	জনাব মোঃ সরদার হাসিবুর রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী গ্রেড-এ	25-Jan-95
৩৫	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী গ্রেড-এ	27-Mar-95
৩৬	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	ঐ	3-Jun-95
৩৭	জনাব কাজী আব্দুর রহিম	ঐ	14-Dec-95
৩৮	জনাব মোঃ সোহরাব আলী	ঐ	11-Aug-96
৩৯	জনাব মোঃ বাবুল মিয়া	ঐ	13-Aug-96
৪০	জনাব মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার	খাদেম গ্রেড-এ	14-Dec-95
৪১	জনাব মোঃ আল আমিন	জুনিয়র কেয়ারটেকার গ্রেড-এ(পিয়ন)	19-Aug-97
৪২	জনাব এ এম মাহবুবুর রহমান	জুনিয়র টেকনিশিয়ান গ্রেড-এ	12-Aug-98
৪৩	জনাব আখের খান	ঐ	18-Aug-98
৪৪	জনাব বদিউজ্জামান বাদাল	ঐ	13-Sep-98
৪৫	জনাব মোঃ আব্দুল গনি	ঐ	20-Dec-98
৪৬	জনাব মোঃ শাহ ইসমাইল	ঐ	25-Jan-99
৪৭	জনাব মোঃ সৈয়দ নুর উদ্দিন	ঐ	8-Mar-99
৪৮	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	ঐ	14-Mar-99
৪৯	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	ঐ	8-Apr-99
৫০	জনাব আকতার হোসেন	ঐ	21-Apr-99
৫১	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	ঐ	13-Jun-99
৫২	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	ঐ	17/9/00
৫৩	জনাব মোঃ আশরাফ আলী	ঐ	24/9/00

রজত জয়ন্তী পূর্তিতে যারা কর্মরত আছেন

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
৫৪	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	ঐ	25/9/00
৫৫	জনাবব মোঃ আলতাফ হোসেন সরকার	ঐ	4-Jan-00
৫৬	জনাব মোঃ খালিদুল ইসলাম	ঐ	13/9/00
৫৭	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	নিরাপত্তা প্রহরী গ্রেড-এ	10-Dec-97
৫৮	জনাব শেখ শাহাদাৎ হোসেন	ঐ	2-Dec-97
৫৯	জনাব মকলেছুর রহমান	ঐ	15-Sep-98
৬০	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	ঐ	13-Dec-98
৬১	জনাব পরিতোষ পাল	ঐ	20-Dec-98
৬২	জনাব মোঃ রেফায়েত উলা	ঐ	9-Jan-06
৬৩	জনাব মোঃ আতাহার আলী	জুনিয়র টেকনিশিয়ান গ্রেড-এ	13-Jul-97
৬৪	জনাব মোঃ আবুল কালাম	ঐ	10-Sep-00
৬৫	জনাব সাইফুল ইসলাম	ঐ	17/9/00
৬৬	জনাব মোঃ একরামুল হক (মিলন)	ঐ	22/4/01
৬৭	জনাব মোঃ ফজলুল হক	ঐ	1-Jul-03
৬৮	জনাব মোঃ নূরু মিয়া	ঐ	1-Jul-03
৬৯	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	ঐ	17-Sep-03
৭০	জনাব মুহাম্মদ ফরিদুল আলম	ঐ	19-Nov-03
৭১	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন	জুনিয়র টেকনিশিয়ান গ্রেড-এ	18-Nov-03
৭২	জনাব মোঃ ইফতে খায়রুল ইসলাম	ঐ	29-Nov-03
৭৩	জনাবা আজুমান আরা বেগম	ঐ	18-Nov-03
৭৪	জনাব টিএম আবুল হাশেম	ঐ	22-May-04
৭৫	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ঐ	11-May-04
৭৬	জনাব মোঃ ইউনুস আলী	ঐ	8-May-04
৭৭	জনাব মোঃ আবু সাঈদ	ঐ	11-May-04
৭৮	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	ঐ	29-Aug-04
৭৯	জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম	ঐ	8-May-04
৮০	জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম	ঐ	29-May-04
৮১	জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	ঐ	30-Jul-05
৮২	জনাব মোহাঃ ইব্রাহীম হোসেন	ঐ	30-Jul-05
৮৩	জনাব মোঃ ইসতিয়াক হোসেন	জুনিয়র টেকনিশিয়ান	30-Jul-05
৮৪	জনাব আওরঙ্গজেব	ঐ	30-Jul-05
৮৫	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ঐ	9-Jan-06
৮৬	জনাব মোঃ আব্দুস ছোবাহান	ঐ	9-Jan-06
৮৭	জনাব মোঃ সাহেব উদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	17-Mar-09
৮৮	জনাব মোঃ শামছুল হক	ঐ	17-Mar-09
৮৯	জনাব অনিল চন্দ্র বর্মন	ঐ	17-Mar-09
৯০	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	ঐ	17-Mar-09
৯১	জনাব মোঃ হায়দার আলী খাঁন	ঐ	17-Mar-09
৯২	জনাব মোঃ আক্কাছ আলী	ঐ	17-Mar-09
৯৩	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	ঐ	17-Mar-09
৯৪	জনাব মোঃ আবদুছ ছামাদ	ঐ	17-Mar-09
৯৫	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ	ঐ	17-Mar-09
৯৬	জনাব মোঃ রুহুল আমীন	ঐ	17-Mar-09
৯৭	জনাব মোঃ আলা উদ্দিন	ঐ	17-Mar-09
৯৮	জনাব আব্দুল ওয়াহিদ	ঐ	17-Mar-09
৯৯	জনাবা কানিজ ফাতেমা জিন্নাত	ডিস্ট্রিবিউটর	8-Jun-09
১০০	জনাবা রুমা খাতুন	ঐ	15-Jun-09
১০১	মিসেস আসমা আক্তার লাকী খান	ঐ	18-Jul-10
১০২	জনাব মোঃ রিপন ইসলাম	জুনিয়র টেকনিশিয়ান	10-Jun-09
১০৩	জনাব মোহাম্মদ পারভেজ	ঐ	16-Jun-09
১০৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	ঐ	10-Jun-09
১০৫	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিলু	ঐ	14-Jun-09

নং	নাম	বর্তমান পদবী	নিয়োগের তারিখ
১	২	৩	৪
১০৬	জনাব হাফেজ মোঃ আবু জাফর	ঐ	15-Jun-09
১০৭	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	জুনিয়র কেয়ারটেশার(ক্লিনার)	16-May-10
১০৮	জনাব মোঃ দুলাল শিকদার	নিরাপত্তা প্রহরী	10-Jun-10
১০৯	জনাব মোঃ কামাল মিয়া	ঐ	10-Jun-10
১১০	জনাব মোঃ জামাদুল ইসলাম	ঐ	9-Jun-10
১১১	জনাব আবু সাইদ মোঃ ইনামুল হক	ঐ	17-Jun-10
১১২	জনাব মোঃ একরামুল হক	ঐ	9-Jun-10
১১৩	জনাব মোঃ হাবিল উদ্দিন	ঐ	13-Jun-10
১১৪	জনাব মোঃ সেলিম রেজা	ঐ	13-Jun-10
১১৫	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	ঐ	5-May-11
১১৬	,, মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ	জুনিয়র টেকনিশিয়ান(উৎঃ)	6-Sep-11
১১৭	,, মোঃ আতিকুর রহমান	ঐ	6-Sep-11
১১৮	,, মোঃ আরিফুজ্জামান	ঐ	6-Sep-11
১১৯	,, মোঃ আব্দুর রহিম	ঐ	6-Sep-11
১২০	,, জামাল আহমেদ	ঐ	6-Sep-11
১২১	,, মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ	6-Sep-11
১২২	,, শহীদুল ইসলাম	ঐ	6-Sep-11
১২৩	,, খন্দকার সোহেল আহমেদ	ঐ	6-Sep-11
১২৪	,, মোঃ মশিউর রহমান	ঐ	6-Sep-11
১২৫	,, মোঃ হেলাল উদ্দিন	ঐ	6-Sep-11
১২৬	,, মোঃ ওহিদুজ্জামান রনি	ঐ	6-Sep-11
১২৭	,, মাহবুবুল আলম	ঐ	6-Sep-11
১২৮	,, মোঃ আমিনুল ইসলাম	ঐ	6-Sep-11
১২৯	,, মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	ঐ	6-Sep-11
১৩০	,, মোঃ আলাল উদ্দিন	ঐ	6-Sep-11
১৩১	,, মোঃ সজীব সরকার	ঐ	6-Sep-11
১৩২	,, আশিকুর রহমান	ঐ	6-Sep-11
১৩৩	,, মোহাম্মদ হাসান	ঐ	6-Sep-11
১৩৪	,, মোঃ আশরাফ হোসেন	ঐ	17-Jun-12
১৩৫	,, মোঃ ইমরানুল হক	ঐ	17-Jun-12
১৩৬	,, মাহফজা খোশনাবীশ	ঐ	18-Jun-12
১৩৭	,, মনির হোসেন রনি	ঐ	17-Jun-12
১৩৮	,, মোঃ শাহিনুর ইসলাম	ঐ	20-Jun-12
১৩৯	,, সজিবুল ইসলাম	ঐ	17-Jun-12
১৪০	,, মোঃ হুমায়ুন প্রধান	ঐ	17-Jun-12
১৪১	,, মোঃ শাহ জেনান	ঐ	20-Jun-12
১৪২	,, মোঃ শামছুল ইসলাম	ঐ	4-Jul-12
১৪৩	,, সেলিনা ইয়াসমিন লাকী	জুনিয়র টেকনিশিয়ান	24-Jun-12
১৪৪	,, মোঃ রুহুল আমীন	ঐ	17-Jun-12
১৪৫	,, সামছুন নাহার	ঐ	24-Jun-12
১৪৬	,, জনেল চাকমা	ঐ	24-Jun-12
১৪৭	,, মোহাম্মদ রাজু আহমেদ	জুনিয়র কেয়ারটেকার	1-Jul-12
১৪৮	,, মোঃ হাফিজুল ইসলাম	ঐ	19-Jun-12
১৪৯	,, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ঐ	19-Jun-12
১৫০	,, মোঃ রমজান আলী	ঐ	18-Jun-12
১৫১	,, মাসুদা আক্তার	ঐ	17-Jun-12
১৫২	,, তানিয়া আফরোজ	ঐ	17-Jun-12
১৫৩	,, আল মামুন সোহাগ	ঐ	25-Jun-12
১৫৪	,, মোঃ মনিরুজ্জামান	ঐ	1-Jul-12
১৫৫	,, মোঃ জাহিদুল ইসলাম মোলা	ঐ	17-Oct-12
১৫৬	,, মোঃ মনোয়ার হোসেন	ঐ	22-Oct-12
১৫৭	,, মোঃ নাজমুন নাহার নাসরিন	ঐ	17-Jun-12

"উল্লেখ্য, পদানুযায়ী সিনিয়রিটি নির্ধারণ করা হলেও সামগ্রীক নিসিয়রিটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি"

চিরতরে
হারিয়ে যাওয়া করপোরেশনের
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের
বিদেহী আত্মার
মাগফেরাত কামনা করছি এবং
শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি
আমাদের সমবেদনা
জ্ঞাপন করছি।

আমরা যাদের হারিয়েছি ...

শফিকুর রহমান	সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা
আব্দুর রাজ্জাক	ভল্ট কাস্টোডিয়ান
নুরুন্নবী	আই.সি.
নাজমুল হক সরকার	আই.সি.
সাইদুর রহমান	এম.এল.এস.এস.
শফিকুল ইসলাম	টেকনিশিয়ান
মোঃ আমজাদ হোসেন	উপ-ব্যবস্থাপক
মোঃ শামসুল আলম	বয়লার অপারেটর
আব্দুল মতিন প্রধান	কেয়ারটেকার
মোঃ জহিরুল হক	মেশিনম্যান
খন্দকার মোস্তফা কামাল	প্রধান প্রকৌশলী
মোঃ ফরিদ উদ্দিন	গাড়ী চালক
মোঃ টিপু সুলতান	অপারেটর
মোঃ মোস্তফা ছাদেক	ভল্ট সহকারী
আবু তাহের সরকার	দক্ষ হেলপার
বদর উদ্দিন আহমেদ	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মোঃ মনোয়ার হোসেন খান	নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আজহার আলী	নিরাপত্তা প্রহরী
আজহারুল ইসলাম	নিরাপত্তা কর্মকর্তা
আলাউদ্দিন শেখ	সার্ভিস বয়
মোঃ গোলজার হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আলমগীর	নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ ইউসুফ আলী সরকার	এ টি ও